বিষ-বিবাহ

ও

প্রেম-পরিণাম।

শ্রী-দামোদর-মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

মহানন্দ প্রেস।

১৩০৪।

মূল্য ৷৶০ দশ আনা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মহানন্দ প্রেস,
১৫৯ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দে দ্বারা মুদ্রিত।

বিষ-বিবাহ।

(উপন্যাস।)

"She will outstrip all praise
And make it halt behind her."

—SHAKESPEARE.

যাঁহার বিনোদনের নিমিত্ত

আমার সর্ব্ব কার্য্য

অনুষ্ঠিত

হয়,

তাঁহারই উদ্দেশে এই

ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানি

উৎসর্গীকৃত

হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
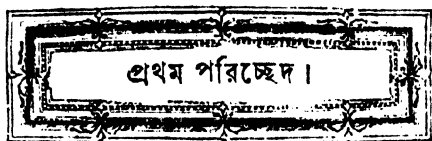
কীর্ত্তি নিকেতন রাজস্থানের অন্তঃপাতী গানোর নামক অতি ক্ষুদ্র প্রদেশের মধ্যে বিঘনির দুর্গ সংস্থাপিত। সেই প্রদেশের রাজা ও রাণী উভয়েই অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছেন। একমাত্র পরমা সুন্দরী কন্যা তাঁহাদের সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী, সেই কন্যার নাম রাধা বাই। আমরা যে সময়ের চিত্র পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে বাসনা করিয়াছি, তখন রাধার বয়স সপ্তদশ বর্ষ। রাধা পিতৃ-পরিত্যক্ত বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী, তদীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্রী ও সর্ব্বেশ্বরী। রাধা অবিবাহিতা।

চৈত্রমাস। সন্ধ্যার আর অধিক বিলম্ব নাই। সমস্ত দিন দুঃসহ তাপে এই শৈল-সঙ্কুল রাজ্য দগ্ধীভূত করিয়া সূর্য্যদেবও যেন অবসন্ন ভাবে ঢলিয়া পড়িয়া-

ছেন। অগ্নি কণবাহী দুরন্ত ঝটিকা এখন মৃদু মন্দ সমীরণ নাম ধারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সংসার যেন নিদারুণ তাপাবসাদ-বিমুক্ত হইয়া সজীবতার লক্ষণ পরিগ্রহ করিতেছে। এইরূপ সময়ে সেই বিশাল বিজনির দুর্গের ছাদের উপর রাধারাণী উপবিষ্টা। যাহার চক্ষু আছে সে দেখিলেই বুঝিতে পারিত, রাধার ন্যায় সুন্দরী ইহ জগতে দুর্লভ। তিনি যে রাণী এবং রাণী হইবেন বলিয়াই যে তাঁহার জন্ম এ কথা তাঁহার মূর্ত্তির উপরে বিশদ অক্ষরে লিখিত আছে।

রাধারাণী সৌধ-শিরে সমাসীনা। প্রাসাদোপরি স্বর্ণ-সূত্র-সংসাধিত সুন্দর শয্যা সমাচ্ছন্ন এক পর্য্যঙ্কে রাণী বসিয়া আছেন। এক সুন্দরী যুবতী পরিচারিকা ধীরে ধীরে ব্যজন করিতেছে, আর একজন অদূরে রাজ্ঞীর ব্যবহারার্থ তাম্বুলকরঙ্ক ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর দুই যুবতী রাণীর সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছে। যে দুইজন রাণীর সম্মুখে বসিয়া তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেছে, অন্যত্র হইলে, তাহারা সুন্দরী-শিরোমণি বলিয়া সমাদৃত হইতে পারিত। সূর্য্যের অত্যুজ্জ্বল আভায় চন্দ্রের

জ্যোতিঃ যেমন খুলিতে পায় না, বিকশিত পদ্মের শোভা ছাড়িয়া নয়ন যেমন পুষ্প-পাত্রস্থ অন্য কুসুমের দিকে ধায় না, বিজলী চমকিলে যেমন ক্ষুদ্র বর্ত্তিকা দীপ্তি পায় না, তেমনই স্থির-গম্ভীর সৌন্দর্য্যময়ী রাধারাণীর সমক্ষে সে দুই বিমলা সুন্দরীও হীনপ্রভ হইয়া রহিয়াছে। রাধারাণী সেই সুন্দরী মণ্ডলী মধ্যে নক্ষত্রনিচয় মধ্যবর্ত্তী পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বসিয়া আছেন। তাঁহার মস্তকের পুরোভাগে, সীমন্ত সমীপে, হীরকাদি খচিত এক অতি শোভাময় সৌবর্ণ্য শিরপেঁচ; তাঁহার কর্ণে রত্ন বিনির্ম্মিত দুল; নাসায় হীরা মুক্তা সমন্বিত অতি ক্ষুদ্র এক নাসালঙ্কার; তাঁহার কণ্ঠে সমস্থূল, সুগোল, সুবিপুলকায় মুক্তামালা; তাঁহার বাহুতে নানা রত্ন-খচিত মনোহর বিজৌটা; তাঁহার প্রকোষ্ঠে মণিময় ছন্দ সমূহ; তাঁহার সুগোল অঙ্গুলিমালা চাকচিক্যময় অঙ্গুরীয়কমালায় বিভূষিত। রাধারাণী ধীরে ধীরে তাম্বুল চর্ব্বন করিতেছেন ও গল্প করিতেছেন। ধীরে ধীরে তাঁহার মস্তক হেলিতেছে ও দুলিতেছে। প্রতি আন্দোলনে তাঁহার কণ্ঠস্থ মালা, কর্ণস্থ দুল ও নাসিকাস্থ ভূষণ আন্দোলিত হইয়া পরম

শোভা বিকাশ করিতেছে। রাজ্ঞী রাধা যে দুই সুন্দরীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন, তাহার একজনের নাম চুণী, অপরার নাম পান্না। অন্যান্য বহু কথার পর রাজ্ঞী বলিলেন,—

"আজ কি ভয়ানক গ্রীষ্ম। কোথাও একটু বাতাস নাই। প্রাণ কিছুতেই শীতল হইতেছে না।"

চুণী ব্যজনকারিণীকে সজোরে ব্যজন করিতে আদেশ করিল। পান্না হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"যদি রাগ না কর ভাই, তবে বলি, তোমার প্রাণ যে শীতল হইতেছে না, কেবল গ্রীষ্মই তাহার কারণ নহে। যদি বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, চন্দনের প্রলেপ প্রয়োগ, সমীরণ সেবন, শীতল স্থানে বাস, কিছুতেই এ অন্তর্জ্বালা যাইবার নহে।"

পান্না সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—

"তাতো বটেই। কিন্তু তা বলিলে কি হয়, রাণী তো তা বুঝিবেন না।"

রাজ্ঞী ঈষদ্ধাস্যের বেগ ওষ্ঠাধরে লুকাইয়া বলিলেন,—

"তোমরা গাত্রদাহের যে কারণ স্থির করিতেছ তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এ গাত্রদাহ আমার চিরসঙ্গী। মরণ না হইলে এ জ্বালার নিবারণ নাই।"

চুণী ও পান্না এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল,—

"বালাই।"

পান্না বলিতে লাগিল,—

"কত রাজপুত্র তোমার ঐ রাঙ্গাচরণে বিকাইবার জন্য লালায়িত। কত রাজ্য তোমার চরণে সমর্পিত হইবার জন্য প্রস্তুত। কত সোণার চাঁদ তোমার দাস হইবার জন্য সাধাসাধি করিতেছে। তোমার ন্যায় ভাগ্যধরী আর কে আছে? তোমার এই রূপ, তোমার এই ঐশ্বর্য্য—এমন আর কাহার আছে?"

রাধা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—

"রাজ্য, ঐশ্বর্য্য রসাতলে যাউক। আমি যদি দরিদ্র-তনয়া হইতাম তাহা হইলে আমার যে সুখ হইত এ রাজপদে তাহার কিছুই নাই।"

চুণী কহিল,—

"জানিনা ভাই, কি মনে করিয়া তুমি এ কথা

বলিতেছ। হয়ত শ্রেষ্ঠীকুমার কিষণলালের মূর্ত্তি তোমার মনে এখনও জাগিতেছে। কিন্তু ভাই, উদয়পুরের রাজার পুত্র, শৈলম্বরের কুমার, মার-বারের মহারাজা, যেদনোরের রাজা, এ সকলের অপেক্ষা সামান্য কিষণলাল যে কি গুণে তোমার মন এত আকর্ষণ করিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। এই সকল রাজা ও রাজপুত্রগণের যাহাকে তুমি চাহ, সেই ব্যক্তি তোমাকে বিবাহ করিয়া তোমার দাস হইতে প্রস্তুত। কিন্তু তাহারা শত সাধা-সাধনাতেও তোমার মন ফিরাইতে পারিল না। সত্য বটে, কিষণলাল বড়ই সুন্দর পুরুষ। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, কেবল রূপই কি জগতে প্রধান পদার্থ? ভগবান তোমাকে যে পদে বসাইয়াছেন সে পদের গৌরব রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। কেবল রূপের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তোমার চলিবে কেন?"

রাধা পুনরায় দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিলেন,—

"তাই বলিতেছি, আমার এ রূপই কাল হইয়াছে। কিন্তু আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর তাহা হইলে আমি বলিব, কিষণলাল মানবাকারে দেবতা। যে দেবতার

সাক্ষাৎ পাইয়াছে, সে আর কখন মানুষ চাহে কি? তোমরা আর যত রাজা ও রাজপুত্রের নাম করিলে তাঁহারা সকলেই মানুষ। আমি দেবতার সাক্ষাৎ পাইয়াছি, মানুষে আমার মন ভিজিবে কেন?"

পান্না বলিল,—

"এত কথা আমরা জানিও না, বুঝিও না।"

চুণী বলিল—

"এক্ষণে উপায়?"

রাধা বলিলেন,—

"উপায় নাই। আমার এই রাজপদ আমাকে অভাগিনী করিয়াছে। তোমারা মনে করিও না যে, আমি নিজের সুখের জন্য সকলকে অসুখী করিব, বা যে কুলে আমার জন্ম তাহা কলঙ্কিত করিব। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব দেহত্যাগ কালে আমাকে সকল বিষয়েই পূজ্যপাদ মন্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ-বশবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে আদেশ করিয়াছেন। সে পিতৃআজ্ঞা আমার হৃদয়ে লিখিত রহিয়াছে। আমার এ বিবাহ মন্ত্রী মহাশয় নিতান্ত অপমানজনক ও একান্ত অকর্ত্তব্য বলিয়া বিশ্বাস করেন; সুতরাং আমার

যতই কেন যন্ত্রনা হউক না, যাহাতে কৌলিক গৌরব বিনষ্ট হইবে, চির-সমাদৃত স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণের নাম কলঙ্কিত হইবে, তাদৃশ কার্য্যে আমি কখনই লিপ্ত হইব না। কিন্তু ইহা তোমরা স্থির জানিও, সুখে বা দুঃখে, সম্পদে বা বিপদে, আমি সেই দেবতার দাসী। তাঁহাকে ইহ জগতে আমি পাইব না স্থির। কিন্তু প্রেম কি কেবল ইহ জগতেরই সামগ্রী? আমার প্রেম কেবল চর্ম্ম-মাংসে আবদ্ধ নহে। ইহ জগতে তাঁহার দাসী হওয়া আমার ভাগ্যে নাই। কিন্তু মরণের পর আমি যে জগতে যাইব, সেখানে এই পদ-গৌরব, এই সুখৈশ্বর্য্য আমার সঙ্গে যাইবে না; সেখানে আমি স্বাধীন হইব। সেই সময়ে আমি প্রাণের সাধে, আমার সেই দেবতার চরণ সেবা করিয়া ধন্য হইব।"

এই সময়ে একজন পরিচারিকা আসিয়া জ্ঞাপন করিল,—

"শেঠ কিষণলাল রাণী মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন।"

রাণী চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"কিষণলাল! কিষণলাল সাক্ষাৎ করিতে চাহেন? আমার সহিত সাক্ষাতে তাঁহার প্রয়োজন? আমি রাজ্ঞী তিনি প্রজা। তিনি কেন এ অসময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন? আমি কেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব?"

পরিচারিকা নিবেদন করিল,—

"রাজ্ঞী যে সকল কথা বলিলেন তিনিও তাহাই বলিয়াছেন। তথাপি বিশেষ প্রয়োজনানুরোধে রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিতেছেন।"

রাজ্ঞী কিছুকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"বিশেষ প্রয়োজন—কি বিশেষ প্রয়োজন তাহা তিনি বলেন নাই? আচ্ছা—আচ্ছা তাঁহাকে আসিতে বলিতে পার।"

রাধা মনে করিলেন, অবশ্যই কোন বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তিনি সাক্ষাৎপ্রার্থী হন নাই। তাঁহার সহিত ইহ জীবনে আর আলাপ ঘটিবে না, একথা শেষ সাক্ষাৎ সময়ে রাধা তাঁহাকে জানাইয়াছেন। সে আজি তিন বৎসরের কথা। এত দিন পরে, আজি এই অসময়ে, তিনি আবার সাক্ষাৎপ্রার্থী;

সুতরাং অবশ্যই তাঁহার প্রয়োজন গুরুতর। অতএব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ অবশ্য কর্ত্তব্য।
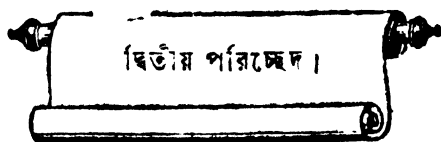
ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে এক ভুবনমোহন যুবক পরিচারিকা সঙ্গে সেই স্থলে সমাগত হইলেন এবং যথাবিহিত পদ্ধতিক্রমে রাজ্ঞীকে প্রণাম করিয়া সুদূরে ভূ-পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন। কিন্তু জান কি তোমরা, ঐ যে সুকান্ত যুবা এমন বিনম্র প্রণাম করিয়া সম্মান জ্ঞাপন করিলেন, তিনি কে? তিনি রাধার প্রাণের প্রাণ, তিনি রাধার জীবন-সর্ব্বস্ব। কিন্তু এ সকল হৃদয়ের কথা। হৃদয় যাহা বলে সকল সময়ে সমাজ তাহাতে কর্ণপাত করে না; তাই যে রাজা সে আজি দাস, আর যে দাসী সে আজি রাণী। তিন বৎসর পরে কিষণলাল রাধার সম্মুখে উপস্থিত। এই সুদীর্ঘ কাল পরে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিয়া রাধার হৃদয়ের যে ভাব হইল তাহা আমরা বলিবার প্রয়াস করিব না।

অমানুষী ধৈর্য্যের সহিত রাধা আপনার পদগৌরব রক্ষা করিয়া রাণীর ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

তখন কিষণলাল যোড়করে কহিলেন,—

“রাজ্ঞি! আপনার এই দীন প্রজা চারিদিক হইতে নিঃসংশয়িত সংবাদ পাইয়াছে যে, অচিরে মুসলমান-গণ আপনার রাজ্য আক্রমণ করিবে। আমরা পুরুষ-পুরুষানুক্রমে আপনাদের প্রজা; সুতরাং আপনার রাজ-শ্রীর কল্যাণ-কামনা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।”

রাজ্ঞী পান্নাকে কি বলিতে বলিয়া দিলে সে বলিল,—

“আপনার রাজভক্তির প্রমাণ পাইয়া রাজ্ঞী সন্তুষ্ট হইলেন।”

শ্রেষ্ঠী করযোড়ে, বলিতে লাগিলেন,—

“কিন্তু কেবল রাজভক্তি ব্যক্ত করিতেই আমি রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থী হই নাই। এ দাসের বিশ্বাস এবার যবন-যুদ্ধে আমাদের নিস্তার নাই। আমাদের স্বাধীনতা-সূর্য্য এবার অস্তমিত হইবে।”

চুণী বলিল,—

“ছিঃ! তাহা মনেও করিবেন না।”

পান্না বলিল,—

"এ কি কথা?"

রাজ্ঞী বলিলেন,—

"চুপ কর। মহাশয় যাহা বলিতেছেন, মন্ত্রী মহাশয় ও আমি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। আপনি রাজভক্ত প্রজা। এরূপ প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে আপনার সম্পূর্ণই অধিকার আছে। এ বিপত্তিকালে আপনি আমাদের কি পরামর্শ দিতে চাহেন?"

বিনীত শ্রেষ্ঠী নতভাবে উত্তর দিলেন,—

"আপনাকে বা আপনার সুযোগ্য মন্ত্রী মহাশয়কে কোন পরামর্শ দিবার স্পর্দ্ধা এ অধমের নাই। এ অধম চিরদিন রাজ্ঞীকে হৃদয়ের হৃদয় হইতে ভক্তি করে। সে ভক্তি, সে শ্রদ্ধা, সে—তাহার সীমা নাই। বাক্যে তাহা ব্যক্ত হইবার নহে।"

শ্রেষ্ঠী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—

"সে ভক্তি, ওঃ সে—এতই প্রগাঢ়—এতই অটল—এতই বদ্ধমূল, যে জীবনে বা মরণে তাহার এক কণিকাও অপচিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহ জগতে,

রাজ্ঞী, আপনিই আমার সুখ, সম্পদ, আশা, শান্তি, সকলই।”

বলিতে বলিতে শ্রেষ্ঠীতনয়ের চক্ষু জলভারাকুল হইল। তিনি নেত্র মার্জ্জন করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—

“কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? হে ভবানীপতি, তুমিই জান এ হৃদয় রাজ্ঞীর কিরূপ অনুগত এবং রাজ্ঞী মূর্ত্তিকে এ হৃদয় কিরূপে অর্চ্চনা করে। কিন্তু আজি, রাজ্ঞি, আপনার ঘোর বিপদ সংবাদ আপনার ভক্তের গোচর হইয়াছে। আপনার জন্য এ দাস নিজ জীবন ব্যয় তো করিবেই করিবে, অধিকন্তু তাহার এক নিবেদন আছে, রাজ্ঞী করুণা প্রকাশ করিয়া তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলে অধম দাস কৃতার্থ হইবে।”

রাজ্ঞীর তখন একটা উত্তর দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু তখন তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে, তিনি উত্তর দিবেন কি? যে উত্তর দিবার জন্য তখন তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল, শত প্রতিবন্ধক হেতু তিনি তাহা ব্যক্ত করিতে অক্ষম। তিনি অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া অতি কষ্টে বলিলেন,—

"বলুন।"

শ্রেষ্ঠীকুমার তখন আপনার অঙ্গরক্ষক মধ্য হইতে এক খণ্ড পত্র বাহির করিয়া পরিচারিকাকে তাহা রাজ্ঞীর চরণে স্থাপিত করিতে কহিলেন। তাহার পর বলিলেন,—

"দেবি, ভগবানের প্রসাদে এ অধম বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। দাসের তাহাতে কোনই প্রয়োজন নাই। এ যবন-যুদ্ধে রাজ-শ্রীর কল্যাণ কামনায় এবং স্বদেশের মঙ্গলোদ্দেশে এ অধম আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিবে স্থির করিয়াছে। প্রাণে তাহার আর মমতা নাই, সুতরাং সম্পত্তিতে তাহার আর প্রয়োজন কি? এই বিপুল বিভব, এই ঘোর বিপত্তি কালে, রাজ্ঞীর হস্তে থাকিলে, প্রভূত হিত সাধিত হইতে পারিবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, এ অধম দাস যাঁহাকে জীবনের ভাবনাপেক্ষাও অধিকতর ভাল বাসে, সেই রাজ্ঞা দেবীর চরণে, তাহার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত, সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিয়া আজি কৃতার্থ হইল। ঐ পত্রে তৎসম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত লিখিত আছে।"

শ্রেষ্ঠী আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে স্থান

হইতে প্রস্থান করিলেন। রাজ্ঞী রাধাবাই তখন সংজ্ঞা-হীনা। বহুক্ষণ পরে যখন তাঁহার চৈতন্য হইল তখন তিনি সম্মুখে নেত্রপাত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতা সেখানে নাই। তখন রাধা বহু-ক্ষণ সেই শয্যায় অধোমুখে শয়ন করিয়া রোদন করিলেন। তাহার পর উঠিয়া বলিলেন,—

"হে দেবতা! তুমি এ অধম সমাজের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের নিমিত্ত যে পন্থা স্থির করিয়াছ, তোমার দাসীও সেই পথ গ্রহণ করিবে। ইহকালে না হউক, পরকালে এ দাসী তোমার ঐ চরণে মনের সাধে প্রাণ লুটাইয়া দিবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অনতিকাল মধ্যেই মুসলমান আক্রমণে গানোর প্রদেশ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল। পঙ্গপালের ন্যায় মুসলমান সেনা এই ক্ষুদ্র প্রদেশকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত করিয়া তুলিল। দুর্গের পর দুর্গ, নগরের পর নগর এবং গ্রামের পর গ্রাম মুসলমানদিগের হস্তগত হইতে লাগিল। হিন্দুদিগের জয়াশা ক্রমেই সুদূরে পলায়ন করিল। রাধারাণীর সৈন্য, সেনাপতি, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী ও প্রজাগণ, বিধর্ম্মী শত্রুগণকে বিজিত করিবার নিমিত্ত সাধ্যাতীত যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু যবনগণ সংখ্যায় বিপুল, এজন্য হিন্দুরা প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও সফলকাম হইতে পারিল না। চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া নাই, এ মহাবাক্যের মধ্যে প্রগাঢ় ও অমূল্য নীতি এবং উপদেশ নিহিত আছে সন্দেহ

নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় সকল সময় এ মহাবাক্য কার্য্যতঃ সফলিত হয় না। প্রতিকূল ঘটনা পরম্পরার খরস্রোত অতিক্রম করা সকল সময়ে সম্ভবপর নহে। এই জন্যই মানব কৃত যত্ন, চেষ্টা ও উদ্যম সর্ব্বত্র সিদ্ধি লাভ করে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে রাজ্ঞী রাধারাণীর প্রকৃতিপুঞ্জের অমিত স্বদেশ বাৎসল্যও সুফল সমুৎপাদন করিতে সক্ষম হইল না। অগণিত বিপক্ষ পক্ষীয়গণ তাঁহাদের তাবৎ চেষ্টা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে লাগিল। ক্রমে দুই একটী সুরক্ষিত দুর্গ ব্যতীত সমস্ত দুর্গ, নগর ও পল্লী যবনগণ আয়ত্তীকৃত করিয়া ফেলিল। গানোর প্রদেশ হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূরিত হইল। বিধবা অবলার আর্ত্তনাদ, পুত্রহীনা জননীর প্রগাঢ় শোকোচ্ছ্বাস, পিতৃহীন শিশুর রোদনধ্বনি, ভ্রাতৃহীন বীরের হুঙ্কার রবে গানোর প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন নগর সমূহ লুণ্ঠিত, দেবমন্দির সমূহ চূর্ণীকৃত, বিগ্রহ সকল অপবিত্রিত, নারীগণ লাঞ্ছিত এবং শিশুগণ নিহত হইতে লাগিল।

রাজ্যের যখন ঈদৃশী দশা তখন এক দিন প্রাতঃকালে রাধারাণী প্রাগুর্ণিত দুর্গের একতম প্রকোষ্ঠে

নিতান্ত ব্যাকুল ভাবে পরিক্রমণ করিতেছেন। প্রকোষ্ঠের এক পার্শ্বে চুণী ও পান্না অবনত মস্তকে দাঁড়াইয়া আছে। রাজ্ঞী ব্যাকুল ভাবে সহচরীদ্বয়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কই, মন্ত্রী মহাশয় এখনও আসিতেছেন না কেন ?"

তাঁহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে, এক জন পরিচারিকা আসিয়া নিবেদন করিল,—

"মন্ত্রী মহাশয় দ্বারে অপেক্ষা করিতেছেন।"

রাজ্ঞী আজ্ঞা করিলেন,—

"তাঁহাকে শীঘ্র লইয়া আইস।"

দাসী চলিয়া গেল এবং অনতিকাল মধ্যে সেই ধবল-কেশ ক্ষীণ-কায় ও গৌর-কান্তি মন্ত্রী মহাশয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া পুনরাগতা হইল। মন্ত্রী দেব রায় বিহিত বিধানে রাজ্ঞীকে সম্মান জ্ঞাপন করিতে প্রবৃত্ত হইতে না হইতে, রাধাবাই নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"মন্ত্রী মহাশয়! এক্ষণে আপনার কি আজ্ঞা?

আর বোধ হয় আমাদের কোন আশা নাই। তবে আর কালব্যাজ না করিয়া জহর ব্রতের * অনুষ্ঠান করা আবশ্যক নয় কি?"

তখন দেব রায় বলিলেন,—

"রাজ্ঞি! এই রাজ্যের আপনিই একমাত্র অধীশ্বরী। রাজ্যস্থ তাবৎ নর-নারীর জীবন ও মরণ, সুখ ও সম্পদ সমস্তই আপনার অধীন। ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের রক্ষা সাধন প্রধান রাজ-কার্য্য। আমাদের এই সনাতন ধর্ম্ম, আমাদের এই চিরন্তন স্বাধীনতা, এবং আমাদের এই অক্ষুণ্ণ গৌরব একবার আমাদের হস্তভ্রষ্ট হইয়া গেলে আর কদাচ পাওয়া যাইবে না। এই সকল পবিত্র মহাব্রত পালনের ভার লইয়া আপনি অবনিমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছেন। আপনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ ভারতের ভরসা আছে। আপনার কর্ত্তব্য এখনও সমাপিত হয় নাই। আপনি

* হিন্দু নারীগণ আপনাদের পবিত্রতা, সতীত্ব ও ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত, দেশ, বিধর্ম্মী যবনগণের হস্তগত হইলে, অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইতিহাসে ইহার অনেক নিদর্শন আছে। এই অনুষ্ঠানের নাম জহর-ব্রত।

এখনই এত ব্যস্ত হইলে, মহাসাগর মধ্যস্থ বাত্যা-বিঘূর্ণিত কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায়, এ রাজ্য অচিরে রসাতলে যাইবে।"

দেব রায়ের কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাধারাণী বলিয়া উঠিলেন,—

"কিন্তু দেব, এ রাজ্য রসাতলে যাইবার আর অপেক্ষা কি? চেষ্টা ও যত্নের কোনই ত্রুটি হইতেছে না, কিন্তু আশা কোথায়? চারি দিকে কেবল অন্ধকার! আপনি জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিজ্ঞতায় অদ্বিতীয়; সেনাপতি মহাশয় যুদ্ধ বিদ্যায় রাজপুতানার প্রধান প্রধান বীরের সমকক্ষ; সৈন্যগণ স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য উন্মত্ত; যখন এত লোকের সমবেত চেষ্টাতেও কোন সুফল ফলিল না, তখন আর ভরসা কোথায়? মন্ত্রী মহাশয়, আপনি কার্য্যতঃ মন্ত্রী হইলেও বস্তুতঃ এই রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা। আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই আমার গ্রহণীয় ও পালনীয়। আমি স্ত্রীলোক, পুরুষে যাহা যাহা করিতে পারে, নারী ইচ্ছা থাকিলে ও সাধ্য হইলেও, তাহা পারে না। যাহার দেহে অপর পুরুষের দেহ স্পৃষ্ট হইলেই কুল কলঙ্কি-

হয়, সে অধম স্ত্রীলোক এরূপ বিপত্তি কালে কি করিবে? হায়! আমি যদি রাজকুমারী না হইয়া রাজকুমার হইতাম, তাহা হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ দেহে শেষ নিশ্বাস থাকিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রু সংহার করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতাম। কিন্তু সে সম্ভাবনা নাই। রাজ্যের এই নিদারুণ বিপত্তিকালে আমি এক জন নিশ্চেষ্ট দর্শকবৎ নির্লিপ্ত; অথচ আমি এই রাজ্যের অধীশ্বরী! ধিক্ আমাকে! রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতা আজি ধনপ্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত, প্রতি গৃহ আজি মর্ম্ম-ভেদী ক্রন্দনের রোলে পরিপূরিত, প্রজাপুঞ্জের পবিত্র শোণিতে আজি রাজ্য পরিপ্লাবিত, নির-পরাধ নরনারীর ছিন্ন মুণ্ডে ও বিগলিত দেহে আজি রাজবর্ত্ম-সমূহ সমাচ্ছন্ন, প্রজাগণের অতি যত্নার্জ্জিত অর্থ ও সম্বল আজি বিলুণ্ঠিত ও অপহৃত, তাহাদের আশ্রয় গৃহ সমূহ আজি পরিত্যক্ত ও ভস্মীভূত। আর আমি তাহাদের রাজ্ঞী, তাহাদের অধীশ্বরী, আমি এই যবনিকার অন্তরালে নিঃসম্পর্কিত ভাবে দাঁড়াইয়া। দুইটা শূন্য দীর্ঘনিশ্বাস, দুই চারিটা

অনাবশ্যক আক্ষেপোক্তি আমার চরম চেষ্টা! ধিক্ আমার জীবনে! ধিক্ আমার জন্মে!"

মন্ত্রী দেব রায় স্নেহময় স্বরে বলিলেন,—

"বৎসে রাধে, আমি তোমাকে স্বহস্তে লালন পালন করিয়াছি, নানারূপ সুশিক্ষায় তোমার হৃদয় আলোকিত করিয়াছি, তোমার পিতৃ-মাতৃ-হীনতা কখন তোমাকে জানিতে দিই নাই। আমি স্বয়ং তোমাকে সিংহাসনে বসাইয়া এ যাবৎ যথাসাধ্য রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি। আমি তোমার স্বর্গগত পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহেরও দাসত্ব করিয়াছি। আমরা পুরুষানুক্রমে তোমাদিগেরই দাস। আমি নিঃসন্তান। আজি তুমি রাজ্ঞী হইলেও, আমি তোমাকে কন্যাবৎ যত্নে পালন করিয়াছি এবং তোমাকে নিজ কন্যা বলিয়াই জ্ঞান করি। বড় আশা করিয়াছিলাম যে, উপযুক্ত সময়ে, উপযুক্ত পাত্রের সহিত তোমাকে বিবাহিতা করিয়া, তোমার সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী দেখিয়া সানন্দে ও নিরুদ্বেগে প্রাণত্যাগ করিব। কিন্তু বিধাতা এ অভাগার সকল সাধে বুঝি বাদ সাধিলেন। বৎসে, এ বিপত্তিকালে তোমাকে

হৃদয় আর রাজ্ঞীবৎ সম্বোধন করিতে পারিতেছে না; আজি আর তোমাকে দুহিতা ভিন্ন কিছুই মনে হইতেছে না এবং তাদৃশ সম্বোধন ভিন্ন অন্য সম্বোধন মুখে আসিতেছে না। আমি তোমার অধীন ভৃত্য হইলেও, বৎসে, আজ আমার এ স্বাধীনতা তোমাকে মার্জ্জনা করিতে হইবে।"

তখন রাধারাণী সাশ্রু নয়নে দেব রায়ের পাদ মূলে পতিতা হইয়া বলিলেন,—

"পিতঃ, আমি আপনাকে পিতা বলিয়াই জানি এবং পিতৃবৎ ভক্তি করিয়াই প্রীত হই। আমি পিতা-মাতা জানিনা, ভাই-ভগ্নী জানিনা, জানি কেবল আপনাকে। আপনি আমার পরম গুরু, আমি আপনার চরণাশ্রিতা দাসী। এখন বলুন পিতঃ, এ বিপত্তিকালে আমার কি কর্ত্তব্য।"

অতি স্নেহের সহিত বর্ষীয়ান্ মন্ত্রী রাজ্ঞীর হস্ত-ধারণ করিয়া উঠাইয়া বলিলেন—

"বৎসে, আমি তোমাকে অতি কঠোর কর্ত্তব্য-পথ সঙ্কেতে দেখাইয়া দিব বলিয়াই এত মায়াকুল হইয়াছি। কিন্তু ধিক্ আমাকে! আমি স্নেহের অনুরোধে

এখনও কর্ত্তব্যকে ভুলিয়া আছি। বৎসে, বড়ই দুঃসময় উপস্থিত; কিন্তু তাই বলিয়া তোমার এত উৎকণ্ঠা এখন শোভা পায় না। অনেক গুরুভার তোমার স্কন্ধে ন্যস্ত এবং অনেক কর্ত্তব্য তোমার এক্ষণে পালনীয়। এই রাজ্যের তাবৎ প্রকৃতি পুঞ্জের নিকট তুমি বহুঋণে আবদ্ধ। তুমি যবনিকার অন্তরালে রহিয়াছ সত্য, কিন্তু বল দেখি, বৎসে, যোদ্ধৃগণ এই ভীষণ সমরে অকাতরে প্রাণ বলি দিতেছে কাহার ভরসায়? প্রজাগণ নিরন্তর শোণিত ক্ষয় করিতেছে কাহার মুখ চাহিয়া? অমিত যবন শত্রুকে আজিও যে এই মুষ্টিমেয় হিন্দু যোদ্ধা সর্ব্বগ্রাস করিতে দেয় নাই, সে কোন্ সাহসে? বৎসে, সকলই তোমার জন্য। তুমি অন্তরালে আছ জানিয়া যাহাদের এই উৎসাহ ও এই অনুরাগ, তোমাকে বারেক সম্মুখে দেখিতে পাইলে, বারেক তোমার মুখের কথা শুনিতে পাইলে, ভাবিয়া দেখ, তাহাদের কি মত্ততা, কি অদম্য উৎসাহ, কি জলন্ত অনুরাগ জন্মিবে। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা হইবেই হইবে। সে জন্য চিন্তা বা উৎকণ্ঠা নিতান্ত নিষ্ফল; কারণ তাহাতে মানবের কর্তৃত্ব নাই। মানব

কর্ত্তব্যের দাস। অদৃষ্টের ভরসায় বসিয়া না থাকিয়া যে মানব কর্ত্তব্য পালনে শিথিলপদ না হয়, তাহারই জীবন সার্থক। রাজ্ঞি! ভবানীপতির প্রসাদে তুমি যে পদ লাভ করিয়াছ তাহার দায়িত্ব বড়ই গুরু। অধুনা তুমি বিষম পরীক্ষা স্থলে উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে সাবধানতা সহকারে বিশেষ বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্য পালন কর। সত্য বটে স্ত্রীলোকের অবস্থা পুরুষের অপেক্ষা অনেক বিভিন্ন; সত্য বটে নারীর সামান্য মাত্র অসতর্কতায় চির সম্মানিত কৌলিক গৌরব বিধ্বংসিত হইতে পারে। কিন্তু বৎসে, সে জন্য এতই কি আশঙ্কা? তাদৃশ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, দেহ হইতে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করিবার শত সহস্র উপায় দেখিতে পাওয়া যাইবে। একখণ্ড লোষ্ট্র সবলে মস্তকে আঘাত করিলে, বা একখণ্ড বিষ-প্রস্তর লেহন করিলে, বা একটী সামান্য লৌহ-শলাকা হৃদয়ে প্রোথিত করিয়া দিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং সে জন্য এত চিন্তা কি ?”

রাধারাণী কিয়ৎকাল গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—

"পিতঃ! বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমার কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইয়াছে। আপনি কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করুন।"

রাধা প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। চুণী ও পান্না তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল।
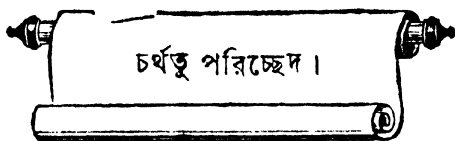
অচিরকাল মধ্যে রাজ্ঞী রাধা ও তাঁহার সহচরিদ্বয় সেই প্রকোষ্ঠে পুনরাগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এ কি বেশ? রাধার কোমল বরবপু এখন লৌহবর্ম্মে সমাচ্ছন্ন; তাঁহার পৃষ্ঠে তূণ, স্কন্ধে প্রকাণ্ড ধনু, দক্ষিণ হস্তে সুদীর্ঘ বর্শা, কটিবন্ধের বাম ভাগে ক্ষুদ্র অগ্নাস্ত্র এবং দক্ষিণ ভাগে এক অসি বিলম্বিত। কোথায় তাঁহার সে মুকুট, কোথায় বা তাঁহার সে ভূষণ সমূহ? তাঁহার মস্তক এখন আয়স-উষ্ণীষে সমাবৃত; রাধা ও তাঁহার সঙ্গিনীদ্বয় এখন যোদ্ধৃ-সজ্জায় সজ্জিত। রাধা আসিয়া মন্ত্রী চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—

"পিতঃ! পন্থা নির্ণীত হইয়াছে; তবে আর বিলম্ব কেন?"

রাধা অদূরে দাঁড়াইলেন, চুণী ও পান্না তাঁহার দক্ষিণে ও বামে দাঁড়াইল। আহা, কি সুন্দর! সুন্দরি! যে তোমাকে পূর্ব্বে দেখিয়াছে, সে কি একবারও মনে করিয়াছে, তোমাকে এ বেশেও এমন সুন্দর দেখাইবে?

বর্ষীয়ান্ সচিব পরম স্নেহের সহিত রাধাকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রুর আবির্ভাব হইল। তিনি বলিলেন,—

"যাও বৎসে, আমি পূর্ণ হৃদয়ে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, রাজ্যের প্রধান শত্রু তোমার দ্বারা নিহত হইবে এবং তোমার কার্য্যে, যে গৌরিবান্বিত কুলে তোমার জন্ম, তাহা আরও সমুজ্জ্বল হইবে। যদি ভবানীপদে আমার অনুমাত্রও মতি থাকে, তাহা হইলে আমার আশীর্ব্বাদ নিষ্ফল হইবে না।"

তখনই দৌড়িতে দৌড়িতে এক দাসী আসিয়া সংবাদ দিল,—

"শ্রেষ্ঠিকুমার দ্বারে বড় ব্যস্তভাবে অপেক্ষা করিতেছেন।"

রাজ্ঞী আদেশ করিলেন,—

"তাঁহাকে আসিতে বল।"

তাঁহার আদেশ বিজ্ঞাপিত হইবার পূর্ব্বেই অসি-হস্তে, যোদ্ধৃবেশে, রক্তাক্ত কলেবর কিষণলাল সেই স্থানে বেগে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন,—

"রাজ্ঞি! মন্ত্রী মহাশয়! আমাদের বুঝি আর ভরসা নাই। সেনাপতি মহাশয় এখনই সমরে প্রাণ হারাইলেন। আমাদের সৈন্যেরা নিতান্ত ব্যাকুল, অবসন্ন ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ অবস্থা আর ক্ষণমাত্রও থাকিলে ভদ্রস্থতা নাই। আমি, সমরে অশক্ত হইলেও, যতক্ষণ জীবন আছে, ততক্ষণ রণস্থল ত্যাগ করিব না স্থির আছে; কিন্তু এ সংবাদ আপনাদের গোচর করিবার অন্য উপযুক্ত লোক না দেখায়, অগত্যা আমাকে আসিতে হইয়াছে। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য শীঘ্র আদেশ করুন। না জানি, এতক্ষণে সমরক্ষেত্রের কি অবস্থা দাঁড়াইল।"

রাজ্ঞী বলিলেন,—

"শ্রেষ্ঠিবর! আপনার দেশভক্তির তুলনা নাই। ইহার পুরস্কার আপনার জন্য প্রস্তুত আছে, কিন্তু ইহ জগৎ সে পুরস্কারের স্থান নহে। পরজগতে তাহা

আপনার আয়ত্তগত হইবে। সেনাপতি মহাশয় সমরে প্রাণ হারাইয়াছেন, সে জন্য আমি দুঃখিত নহি। কারণ এ যুদ্ধে আমাদের সকলকেই তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহার বিয়োগ জনিত কষ্ট অধিক-ক্ষণ ভোগ করিতে হইবে না; কারণ শীঘ্রই স্বর্গ-লোকে তাঁহার সহিত সকল আত্মীয়ের সম্মিলন সংঘটিত হইবে। আমাদের আশা নাই তাহা স্থির। কিন্তু তাই বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকিলে আমাদের কর্ত্তব্যপালনে অবহেলা করা হয়। সুতরাং কোনমতেই যেন চেষ্টার অভাব না ঘটে।”

কিষণলাল বলিলেন,—

“কিন্তু দেবি, সেনাপতি মহাশয়ের অভাবে সকল চেষ্টাই অসম্ভব। ক্ষেত্রে নায়ক নাই, যিনি যুদ্ধ চালাইবেন তিনি নাই, সুতরাং সৈন্যেরা নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও হতাশ হইয়াছে। এখন মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া, রণস্থলে উপযুক্ত নেতা পাঠাইতে না পারিলে, সকল সৈন্যই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। তখন আর কি চেষ্টার অবসর থাকিবে?”

মন্ত্রী বলিলেন,—

"মহাশয় বলুন এখন কাহাকে সেনাপতি মহাশয়ের পদে প্রতিষ্ঠিত করি ? সৈন্যগণের এখন যে অবস্থা তাহাতে অধুনা বিগত সেনাপতি মহাশয়ের অপেক্ষা বহুগুণে সম্মানিত ও ভক্তিভাজন একব্যক্তি নেতৃত্ব গ্রহণ না করিলে, তাহাদের হৃদয় আবার প্রকৃতিস্থ ও উৎসাহময় হইবে এমন বোধ হয় না।"

তখন রাধারাণী বলিলেন,—

"শ্রেষ্ঠী মহাশয়, এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি স্বয়ং সেনাপতি মহাশয়ের কার্য্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম। আপনি আর অনুমাত্র বিলম্ব না করিয়া সমরক্ষেত্রে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিউন। আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গেই রণস্থলে উপস্থিত হইতেছি।"

শ্রেষ্ঠি-নন্দন বলিয়া উঠিলেন,—

"জয় রাধারাণীকি জয়!"

সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ মন্ত্রী, চুণী ও পান্না শ্রেষ্ঠিনন্দনের সহিত যোগ দিয়া বলিলেন,—

"জয় রাধারাণীকি জয়।"

সেই শব্দ দ্বার-রক্ষক ও পুররক্ষীদের কর্ণে প্রবেশ করিলে, তাহারা চীৎকার করিল,—

"জয় রাধারাণীকি জয়! জয় রাধারাণীকি জয়! জয় রাধারাণীকি জয়!"

সেই জয়-ধ্বনি ক্রমে নগরে ও রাজপথে পরিব্যাপ্ত হইতে হইতে অচিরে সমর-স্থলেও তাহার প্রতিধ্বনি উপস্থিত হইল। তখন সেই সহস্র সহস্র রণোন্মত্ত কণ্ঠ হইতে শব্দ সমুত্থিত হইল,—

"জয় রাধারাণীকি জয়!"

দূরে গম্ভীরে সেই ধ্বনি কাঁপিতে কাঁপিতে চলিল এবং গ্রাম, নগর, প্রান্তর, পর্ব্বত, অরণ্য ও স্রোতস্বতী সেই মধুর জয়-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তখন জলে, স্থলে, ব্যোমে ও ক্ষিতিতলে সেই অপূর্ব্ব ধ্বনি তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। সেই মহোৎসাহ-ময় সময়ে রাধারাণী অশ্ব-পৃষ্ঠে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। চুণী ও পান্না স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অশ্বে তাঁহার উভয় পার্শ্বে। তাঁহার সম্মুখে কিষণলাল এক সমুন্নত অশ্বারোহণে পথ প্রদর্শকরূপে এবং পশ্চাতে এক শ্বেত অশ্বে প্রবীণ মন্ত্রী মহাশয়। অগণ্য রক্ষী তাঁহাদের চারিদিকে। সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র কিষণলাল সমুৎসাহে চীৎকার করিলেন,—

"জয় রাধারাণীকি জয়!"

তখন সেই রক্তাক্ত, উৎসাহময় অগণ্য নয়ন, বারেক অন্য কর্ম্ম ভুলিয়া, সেই দিকে ফিরিল। তাহারা দেখিল কি? দেখিল তাহাদের ভক্তির একমাত্র কেন্দ্র, আনন্দের একমাত্র নিকেতন, শ্রদ্ধার একমাত্র প্রিয়স্থান, গৌরবের একমাত্র রঙ্গভূমি এবং উৎসাহের একমাত্র উৎস রাধারাণী আসিয়া স্বয়ং যুদ্ধভার গ্রহণ করিলেন। অগণ্য কণ্ঠ আবার আনন্দোন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিল, "জয় রাধারাণীকি জয়!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
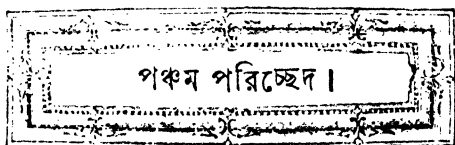
রাণারাণীর এত যত্ন, এত অধ্যবসায়, এত ত্যাগ-স্বীকার সকলই বুঝি বৃথা হইল। আর কি লইয়া তিনি যুদ্ধ করিবেন? সমর-কুশল সেনাপতি মহাশয় পূর্ব্বেই প্রাণ হারাইয়াছেন, সৈন্যগণের ভূরিভাগ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইয়াছে। শোণিত-স্রোতে সমরাঙ্গন প্লাবিত। মুমূর্ষুর কাতর-ধ্বনি, শত্রুগণের জয়োল্লাস, বীরগণের আস্ফালন, অগ্নিবর্ষী নিপাতকারী অস্ত্রসমূহের বজ্র নাদ, নানাবিধ রণায়ুধের ঝণঝণা, অশ্ব সকলের হ্রেষা-রব প্রভৃতি নানাবিধ বিরোধী ধ্বনিতে রণভূমি ঘোর কোলাহলময়। সেই ভরসাহীন সময়ে—সেই আশা বিরহিত সমরক্ষেত্রে—স্বয়ং রাণারাণী নিরন্তর অস্ত্র-চালনা করিতেছেন এবং স্বপক্ষীয়গণকে উৎসাহিত করিতেছেন। হতাবশেষ সৈন্যগণ জয়াশা অনেকক্ষণ

পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহারা ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায়, সমরক্ষেত্রে বিপক্ষ হস্তে প্রাণপাত করিয়া, সূর্য্যলোকে স্থান লাভ করিবার সঙ্কল্পে, এখনও রণভূমি ত্যাগ করে নাই। কিন্তু তাহারা তখন ঘোর চিন্তায় আকুল। যুদ্ধে তাহাদের তখন আর বিশেষ লক্ষ্য নাই; তাহাদের তখন বিশেষ লক্ষ্য রাজ্ঞীকে রক্ষা করা। রাজ্ঞীর পুণ্য ও পবিত্রতাময়, পূজনীয় কায়া পাছে যবনের করায়ত্ত হয়, তাহাই তখন তাহাদের একমাত্র চিন্তা ও আশঙ্কার কারণ। সেই দেবীর প্রাণান্ত হইলেও, তাঁহার দেহ যবন কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, সুতরাং কলঙ্কিত ও অপবিত্রীকৃত হইতে পারে, এই চিন্তায় তাহারা আকুল। এই জন্য তখন যুদ্ধ অপেক্ষা রাজ্ঞীর দেহ রক্ষা করাই তাহাদের প্রিয়তর ব্রত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা তখন তাহাদের পুণ্যস্বরূপা রাজ্ঞীকে বেষ্টন করিয়া, তাঁহার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। আত্মরক্ষার কথা তাহাদের তখন মনে নাই, প্রাণের মায়া তাহারা অনেকক্ষণ বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং দেশের ও স্ব স্ব স্ত্রী-কন্যার পরিণামে কি দুর্দ্দশা হইবে তাহাও তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে।

বিপক্ষ পক্ষের লক্ষ্য সর্ব্বাংশে ইহার প্রতিকূল। রাধারাণীকে বন্দিনী করাই বিপক্ষ-পক্ষনায়ক নবাব আলি বাহাদুরের সর্ব্বপ্রধান চেষ্টা। রাধারাণী সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হওয়ার পর হইতে, তিনি সেই লোক-ললামভূতা সুন্দরীর সুললিত কান্তি দেখিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন। তখন যুদ্ধ, জয়, পরাজয়, শত্রু-নিপাত, দেশাধিকার কিছুই তাঁহার মনে নাই। সুন্দরী-শিরোমণি রাধারাণীকে আয়ত্তীকৃত করাই তখন তাঁহার একমাত্র বাসনা। অদম্য সমর-সাধ ও শোণিত-পিপাসা তাঁহার তখন নাই। রাজ্যলাভ করা দূরে থাকুক, এ পর্য্যন্ত তিনি যত রাজ্য জয় করিয়াছেন তৎ-সমস্তই তিনি তখন রাধারাণীর চরণারবিন্দে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। তিনি বাসনা সিদ্ধির অভিপ্রায়ে আপনার সমস্ত বল ও তাবৎ চেষ্টা পরিচালিত করি-লেন। সে প্রবল প্রতিপক্ষগণের প্রতিকূল গতি প্রতি-রুদ্ধ করা তখন হিন্দুগণের পক্ষে সর্ব্বথা অসম্ভব। তাঁহারা সকলেই তাহা প্রণিধান করিয়া চিন্তায় আকুল। সম্ভাবিত বিপদের গুরুতা স্মরণ করিয়া তাঁহারা প্রাণ-পণ যত্নে শত্রুসংহারে নিবিষ্টচিত্ত। স্বয়ং বর্ষীয়ান

মন্ত্রী মহাশয় যুবকের ন্যায় উদ্দাম ও উৎসাহ সহকারে অস্ত্রচালনা করিতেছেন। আর শ্রেষ্ঠীনন্দন কিষণলাল? তিনি রক্তাক্ত কলেবর ও বহু আঘাতে জর্জ্জরীভূত হইয়াও যুদ্ধে বিরত হন নাই। তাঁহার শোণিতশূন্য ক্ষীণ বাহু তখনও পূর্ণ তেজে অসি চালনায় নিযুক্ত। কিন্তু হায়! কি সর্ব্বনাশ! সকল ভরসার উৎস, সকল বুদ্ধির আকর, রাধার সর্ব্ব কার্য্যের পথ-প্রদর্শক, প্রবীণ, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি মন্ত্রীর বক্ষস্থলে সহসা এক প্রচণ্ড আঘাত লাগিল। তৎক্ষণাৎ তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক সেনানী সমবেত হইয়া তাঁহাকে বাহুতে তুলিয়া লইল এবং সমর-ক্ষেত্রের কেন্দ্র-স্থানে, রাধারাণীর সমীপে, আনয়ন করিল। বহু শুশ্রূষায় তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি অতি ক্ষীণস্বরে বলিলেন,—

"বৎসে! আর আমাদের কোন আশা নাই। তোমাকে এখানে আসিতে দিয়া ভাল কাজ করি নাই। আমার মৃত্যু দেখিয়া দুঃখ করিও না। আজি ইহার হাত কেহ ছাড়াইতে পারিবে বোধ হয় না।

তুমি হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিও না। তুমি যতক্ষণ জীবিত থাকিবে, ততক্ষণ দেশের ভরসা থাকিবে। দেশকে সহজে ম্লেচ্ছের হস্তে তুলিয়া দিও না। যখন মুসলমান হস্ত হইতে নিস্তারের কোনই উপায় নাই দেখিবে, তখনই প্রাণত্যাগ করিবে। তাহার পূর্বে নহে। বলে ও কৌশলে যেমন করিয়া পার শত্রু নিপাতের চেষ্টা করিবে। আপাততঃ শীঘ্র পলাইবার চেষ্টা কর। সাবধান, কুলে যেন কলঙ্ক না স্পর্শে।"

অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ এই কথা কয়টিমাত্র বলিয়া নীরব হইলেন। দারুণ আঘাত জনিত রক্তক্ষয় হেতু দেবরায়ের জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া গেল। রাণার নয়নে দুই বিন্দু—দুই বিন্দু মাত্র জল। তখন চুণী গলদশ্রু লোচনে জিজ্ঞাসিল,—

"দেবি! এক্ষণে আমাদের আর কে রক্ষা করিবে? আমরা এখন আর কাহার ভরসায় থাকিব?"

রাণা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"ভয় কি? আমাদের আর অধিকক্ষণ থাকিতে হইবে না। এতদিন আমরা যাঁহার ভরসায় ছিলাম

শীঘ্রই আমাদের তাঁহার নিকটে যাইতে হইবে। তবে আর ভাবনা কি?"

এইরূপ সময়ে রণ-শ্রান্ত অবসন্ন কিষণলাল রাজ্ঞীর সমীপস্থ হইয়া নিবেদন করিলেন,—

"দেবি! এক্ষণে পলায়ন ভিন্ন আর নিস্তারের কোনই সম্ভাবনা নাই। রাজ্ঞি! আপনি আর অণুমাত্র কাল-ব্যাজ না করিয়া সমর-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করুন এবং যত শীঘ্র সম্ভব, কোন দুর্গে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন। এক্ষণে অন্য কোন উপায় নাই।"

রাজ্ঞী বলিলেন,—

"তাহাতে লাভ? মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তারের কোনই উপায় নাই। উপায় থাকিলেও, সমস্ত রাজ্য যবন-করে সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং জীবিত থাকিবার চেষ্টা করার অপেক্ষা মরণ সহস্রগুণে ভাল। তবে কেন?"

কিষণলাল বলিলেন,—

"আমি সে জন্য বলিতেছি না। আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করুন। আপনার দেহ যবন-করে পড়িলে কি সর্ব্বনাশ হইবে তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন। মরিতেই যদি

হয়, তাহা হইলে আপনার এরূপে—এমন স্থানে সরিতে হইবে যে বিপক্ষেরা আপনার সন্ধানও না পায়।”

রাধারাণী বলিলেন,—

“তাহা তো বুঝিলাম, কিন্তু এখন পলাইতে পারি কই? আমরা পশ্চাৎপদ হইলেই শত্রুরা আমাদের অনুসরণ করিবে। তখন আমাদের দশা কি হইবে?”

কিষণলাল বলিলেন,—

“আপনি সে চিন্তা করিবেন না। আমি এমন ব্যবস্থা করিব, যে অন্ততঃ বহুক্ষণ শত্রুরা আপনাদের নিকটস্থ হইতে পারিবে না। আপনি সেই অবকাশে কোন নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে পারিলে, আপাততঃ সকল দিক্ রক্ষা হইবে।”

রাধারাণী বলিলেন,—

“ভাল তাহাই হউক। আপনার সহিত, বোধ হয়, ইহ জীবনে আর সাক্ষাৎ ঘটিবে না। কিন্তু এ জীবনের পরেও আমাদের জীবন আছে।”

রাধারাণী বিপরীত দিকে অশ্ব ফিরাইলেন ও সহচরিদ্বয় সমভিব্যাহারে রণভূমি হইতে নক্ষত্রবেগে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
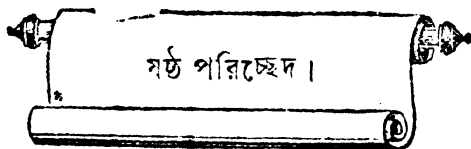
কিষণলাল যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহা হইল না। রাধারাণী সমর-ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করার পর, মুসলমানগণ তাঁহার অনুগামী হইয়া, তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে, সবেগে ধাবমান হইল। কিষণলাল মনে করিয়াছিলেন, এখনও তাঁহাদের যে কয়জন সেনা আছে, তাহাদের নিপাত করিয়া ও তাহাদের হাত ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতে শত্রুগণের অবশ্যই অনেক সময় লাগিবে। সেই সময়ের মধ্যে রাজ্ঞী অবশ্যই কোন নিরাপদ দুর্গে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার মীমাংসা কার্য্যকালে সফলিত হইল না। রাধারাণী সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন দেখিয়া, সৌন্দর্য্য-মোহান্ধ নবাব সাহেব এরূপ ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন, যে তিনি অন্য কোন দিকেই মনোযোগ না দিয়া,

স্বপক্ষীয়গণকে যেমন করিয়া হউক, অবিলম্বে বিপক্ষ-পক্ষ ভেদ করিয়া, রাজ্ঞীর অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্র, বেগবতী নদী-প্রবাহের ন্যায়, মুসলমানগণ সজোরে হিন্দুগণকে অতিক্রম করিয়া ধাবিত হইল। সেই বেগে হিন্দুদের যে কয়জন মাত্র জীবিত ছিল, তাহারও অনেকে আহত, দলিত, হত ও মৃতকল্প হইয়া পড়িল। হিন্দুদিগের শেষ চেষ্টা নিষ্ফল হইল। তাঁহারা কোন মতেই শত্রুগণের গতিরোধ করিতে সক্ষম হইলেন না।

যে পথে রাধা গমন করিয়াছিলেন, নবাব ও তাঁহার সৈন্যগণ, তীরবেগে সেই পথে অশ্ব চালাইলেন। তাঁহাদের উদ্যম ও যত্ন বিফল হইল না। যে অতুল-নীয় লোভজনক পুরস্কারের লোভে নবাব সাহেব এতাদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিতেছিলেন, তাহা অচিরে তাঁহার নয়ন পথবর্ত্তী হইল। তখন নবাবের উৎসাহ আরও শত গুণে সংবর্দ্ধিত হইল। তখন তিনি উন্মত্ত-বৎভাবে, স্বীয় দলবল সঙ্গে, সেই অপরিসীম লোভনীয় রমণী-রত্ন হস্তগত করিবার জন্য, প্রধাবিত হইলেন। তখন রাধা, আপনার বিপদের পরিমাণ সম্পূর্ণরূপে

প্রণিধান করিয়া, যতদূর সম্ভব বেগে অশ্ব চালাইয়া, শত্রুগণের হস্ত হইতে দূরে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! বুঝি সকল চেষ্টাই বিফল হয়। আর কিয়দ্দূর—অর্দ্ধ ক্রোশাপেক্ষাও অল্প পথ—অতিক্রম করিতে পারিলে, রাধারাণী সম্মুখস্থ ঐ সুবিশাল গিরি-দুর্গে আশ্রয় লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বুঝি সে চেষ্টা বিফলিত হয়? শত্রুরা বড়ই নিকটস্থ হইয়াছে। তাহাদের অশ্ব-পদ-ধ্বনি রাধারাণীর কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। তিনি তখন প্রায় বাহ্য জ্ঞান শূন্যা। কিন্তু আর তো নিষ্কৃতি নাই! যবন শত্রুগণ অতি নিকটে। আর অতি অল্প—কয়েক ব্যাম মাত্র—অতিক্রম করিতে পারিলে দুর্গদ্বারে উপনীত হওয়া যায়। রাধার অদৃষ্টে কি সে সৌভাগ্য ঘটিবে না? রাজ্য, ধন, জন, সকলই রাধা হারাইয়াছেন; কিন্তু সে জন্য তিনি একটুও কাতর নহেন। তিনি যে জন্য ব্যাকুল, তাঁহার সেই কুল-গৌরব, তাঁহার সেই স্বধর্ম্ম, তাঁহার সেই পিতৃপিতামহাদি মহাপুরুষদিগের মহামহিমাময় নাম, সকলই কি আজ ঘোর পঙ্কিল হ্রদে, চিরদিনের নিমিত্ত, ডুবিবে? না, ঐ যে

রাধারাণী সেই বিশাল দুর্গদ্বারে উপনীত হইয়াছেন। ঐ যে তিনি, সলম্ফে অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া, সহচরিদ্বয়ের সঙ্গে, সবেগে দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, শত্রুরাও যে আসিয়া পড়িয়াছে। দুর্গে কয়েক জন মাত্র রক্ষক ছিল; তাহারা যবনগণকে দুর্গ-প্রবেশার্থী বুঝিয়া যুদ্ধার্থে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। নবাবের সৈন্যেরা সে কয় জনকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিল। তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড, ভিন্ন দেহ ও গলদ্রুধির-প্রবাহ, দুর্গদ্বারে সমাগত, বিধর্ম্মী যোদ্ধাগণের প্রথম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের নিদর্শন স্বরূপে, নিপতিত রহিল। তখন সেই বিপুলা-বয়বা, তরঙ্গ-রঙ্গ-ভঙ্গিনী নর্ম্মদা তীরস্থ সেই গিরি দুর্গ নবাব সাহেবের সম্পূর্ণ অধীন হইল। সুতরাং তন্মাধ্যগতা সুন্দরী লাভ পক্ষে তাঁহার আর কোনই অসুবিধা বা প্রতিবন্ধক থাকিল না। তিনি পার্শ্বস্থ একজন কর্ম্মচারীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"দেখ, খোদাবক্স! এ দুষ্ট বিবি এবার আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়াছে; এখন আর পলাইবার জায়গা নাই। তবে আর যায় কোথা?"

খোদাবক্সের জ্ঞানকাণ্ড, বোধ হয়, প্রভুর অপেক্ষা একটু মার্জ্জিত ছিল। সে বলিল,—

“হাঁ হুজুর। কিন্তু আমি জানি হিঁদুর মেয়ে বড় শক্ত জিনিষ। ওরা কখন কখন এমন জায়গায় পলাইতে জানে, যে সেখানে আর ছুটিয়া সঙ্গে যাওয়া যায় না।”

নবাব সাহেব এ উপদেশের মর্ম্ম প্রণিধান করিতে না পারিয়া বলিলেন,—

“বটে? তুমি তবে এই কেল্লার চারিদিকে ভাল করিয়া পাহারা বিলি করিয়া দেও, যেন মাছিটীও পলাইতে না পায়। আর তুমি নিজে সকল পাহারার উপরে খবরদারী করিতে থাক। আমি দেখি, এ বুল্‌বুল্‌ সহজে ধরা দেয় কি না।”

এই রূপ রসিকতা রূপ “মধুরেণ” ব্যবস্থা সমাপ্ত করিয়া, নবাব সাহেব সুন্দরী সম্ভাষণে গমন করিলেন।

এ দিকে রাধা, চুণী ও পান্না দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বিতলে আরোহণ করিলেন এবং একতল হইতে দ্বিতলে গমন করিবার যে যে দ্বার ছিল, সাবধানতা সহকারে, তত্তাবৎ রুদ্ধ করিলেন। তখন পান্না বলিল,—

"দেবি! এ সাবধানতায় কি লাভ হইবে? ঐ দ্বার ভগ্ন করিতে তাহাদের কতক্ষণ সময় লাগিবে?"

রাজ্ঞী বলিলেন—

"তাহাদের দ্বার ভাঙ্গিবার কষ্টই বা দিব কেন? নবাব সাহেব যদি দয়া করিয়া এদিকে আসিতে চাহেন, তাহা হইলে আমরা আপনারাই তাঁহাকে আদর করিয়া দ্বার খুলিয়া দিব।"

তখন চুণী বলিল,—

"সে কথা যাউক, এখন উপায়? আমাদের রক্ষকেরাও মারা গিয়াছে; এমন লোকটী নাই যে আমাদের জন্য এখন চিতা সাজাইয়া দেয়। আপনার নিকটে বিষপাথর আছে। এখন সকলে মিলিয়া, ভগবানের নাম করিতে করিতে তাহাই খাই, আসুন।"

রাধারাণী হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"বালাই! এ নবীন বয়সে, এমন সাধের প্রাণ, কেন হেলায় হারাইব সখি? কেন, নবাব সাহেবের যদি বেগম হইতে পাই, সে কি কম সৌভাগ্য?"

সখীরা রাজ্ঞীর কথা শুনিয়া ও তাঁহার ভাব দেখিয়া

অবাক হইল। তাহারা কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই রাজ্ঞী আবার বলিলেন,—

"এই দুর্গেও আমার নানা প্রকার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার থাকিত। আজি নবাব সাহেবের মন ভুলাইতে হইবে; কাজেই, খুব ভাল রকম পোষাক করিয়া, খুব বেশ ভুষা করিতে হইবে। যদি নবাব সাহেবকে ফাঁদে ফেলিতে পারি, তবেই তো জীবন সার্থক। তোমরা আমাকে কেমন সাজাইতে পার আজ দেখিব। এখন চল দেখি, কোন পোষাক পরিলে আমাকে খুব ভাল দেখাইবে তাহা বাছিয়া বাহির করি।"

রাধারাণী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রে গমন করিলেন, সখীরা ঘোর বিস্ময় সহকারে তাঁহার অনুগামিনী হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নবাব সাহেব, কয়েকজন অনুচর সঙ্গে, দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নিম্নতলের সমস্ত প্রকোষ্ঠ তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি রাণারাণী বা তাঁহার সঙ্গিনীদের, দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি দ্বিতলে আরোহণ করিবার জন্য সোপান অবলম্বন করিলেন; কিন্তু শেষস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দ্বার রুদ্ধ। সে সোপান ত্যাগ করিয়া তিনি স্বতন্ত্র এক সোপান-পথে আরোহণ করিলেন, কিন্তু তথায় সমানই ফল হইল। তখন সেই সুন্দরী-সঙ্গ-লোলুপ নবাব; অনুচরগণকে রুদ্ধ দ্বার ভগ্ন করিতে আদেশ করিলেন। প্রভুর নিদেশ বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা সেই দ্বারে প্রচণ্ড আঘাত করিতে লাগিল। লৌহ দ্বার ঝন ঝন শব্দে বাজিয়া উঠিল। তাহারা কিন্তু হস্তে বড় ব্যথা পাইল, সুতরাং, আবার সহসা হস্ত দ্বারা কপাটে

আঘাত না করিয়া, তাহাদের কেহ কেহ আঘাত করিবার উপযোগী দ্রব্য সংগ্রহ। করিতে চলিয়া আসিল। তখন দ্বারের অপর দিক হইতে শব্দ হইল,—

"কে এখানে ? এরূপ অত্যাচারের প্রয়োজন ?"

শব্দ নবাবের কর্ণে বীণা-ঝঙ্কারবৎ ধ্বনিত হইল। তিনি মনে করিলেন, এমন মধুময়, অমৃতবর্ষী কণ্ঠস্বর সেই সুন্দরী-কুল-কমলিনী রাধারাণী ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে? তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া এবং স্বীয় কর্কশ ও বিকট কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য কোমল করিয়া বলিলেন,—

"রাণীজী ! অত্যাচার যদি কিছু হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেজন্ত অপরাধী আপনার ঐ রূপ।"

রাণীজী সেখানে উপস্থিত ছিলেন বটে, কিন্তু কথা তিনি কহেন নাই। কথা কহিয়াছিল পান্না। সে নবাব সাহেবের কথায় বাধা দিয়া বলিল,—

"জাঁহাপনা, আমি রাণীজীর দাসী। আপনি স্বয়ং এখানে আসিয়া, এত কষ্ট করিয়া কবাটে আঘাত করিয়াছেন তাহা আমরা জানিতে পারি নাই বলিয়া,

এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু সে জন্য আমরা বড়ই লজ্জিত হইতেছি। এক্ষণে আপনার আদেশ কি, তাহা রাণীজী জানিতে চাহেন।”

নবাব সাহেব হাতে স্বর্গ পাইলেন। রাধা—তেজস্বিনী হিন্দু রমণী রাধা—তাঁহার সহিত এরূপ সদয় ব্যবহার করিবেন, একথা তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই। তিনি সহর্ষে উত্তর দিলেন,—

“তাঁহাকে আমি আদেশ করিব? আমি তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া লইতে রাজি আছি। আমার জান্ এক দিকে, আর তোমাদের রাণীজী এক দিকে।”

আবার পান্না বলিল,—

“নবাব সাহেবের এই সকল সদ্ব্যবহারে, মিষ্ট কথায় এবং সরল ভাবে আমাদের রাণীজী বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন। নবাব সাহেবের এই সকল সৌজন্যের প্রতিশোধ দিবার জন্য তাঁহার মন বড়ই ব্যাকুল। কিন্তু তিনি স্ত্রীলোক—অতি সামান্য স্ত্রীলোক, নবাব সাহেবের গুণের পুরস্কার দেওয়া কখনই তাঁহার সাধ্য নহে।”

নবাব সাহেব এবার মাতিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—

"তিনি যদি সামান্য স্ত্রীলোক তবে আর মহৎ কে? তিনি যদি কৃপা করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার গোলাম হইতেও রাজি আছি।"

পান্না আবার বলিল,—

"ছি ছি! এমন কথা আপনি মুখেও আনিবেন না। আমাদের রাণীজী আপনার দাসী হইবারও যোগ্যা নহেন বলিয়া জানেন। আপনি এরূপ কথা বলিলে তাঁহাকে কেবলই লজ্জা দেওয়া হয়।"

উন্মত্ত নবাব বলিলেন,—

"তিনি দাসী? তিনি আমার মাথার মণি, আমি তাঁহার ক্ষুদ্র নফর। আমার এই রাজ্য, ধন, জন সকলই তাঁহার চরণে দিয়া আমি চিরদিন তাঁহার দাসত্ব করিতে পাইলেও সুখী হইব।"

পান্না উত্তর দিল,—

"নবাব সাহেবের কথা আমাদের রাণীজী সহজে বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। আপনি রাজরাজেশ্বর নবাব। শত সুন্দরী মহিলা নিয়ত আপনার পদসেবা করিয়া কৃতার্থ হয়। তাহাদের নিকটে যখন আপনি উপস্থিত হইবেন, তখন এ

কুরূপা, অরসিকা, সামান্যা হিন্দু কন্যাকে কি আপনার মনে পড়িবে?”—

পান্নার বক্তব্য শেষ হইবার পূর্ব্বেই নবাব বাধা দিয়া বলিলেন,—

“আমার আরও মহিলা আছে সত্য, কিন্তু তোমাদের রাণীজীর তুলনায় তাহারা বাঁদী। রাণীজী যদি এ অধমের প্রতি কৃপা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমার সর্ব্বেশ্বরী—খাস্ বেগম করিয়া আমি চিরদিনের জন্য তাঁহার চরণে বিকাইয়া থাকি।”

এবার পান্না বলিল,—

“এত সুখ সৌভাগ্য অদৃষ্টে ঘটিবে বলিয়া রাণীজী মনে ধারণা করিতেই পারিতেছেন না। তাঁহাকে যে আপনি দাসী করিতে সম্মত আছেন, তাঁহার এ আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই। আমরা রাণীর সখী। আমরা জানিতে বাসনা করি, তাহা হইলে কবে আপনাদের শুভ বিবাহ হইতে পারে?”

নবাব বলিলেন,—

কবে কি? আজই—এখনই। রাণীজী আজ্ঞা করিলে এখনই বিবাহের ব্যবস্থা করা যায়।”

পান্না বলিল,—

"রাণীজীরও তাহাই ইচ্ছা। এ শুভ কার্য্যে আর একটুও বিলম্ব করিতে তাঁহার মন নাই। তবে রাণীজী স্ত্রীলোক—সম্প্রতি তাঁহাকে যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তাহাতে তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। সে শ্রমের অনুরূপ বিশ্রাম করিতে হইলে অন্ততঃ দুই তিন দিন সময় আবশ্যক; কিন্তু তত বিলম্ব তাঁহার সহে না। একারণ নবাবের নিকট তিনি বিশ্রামের জন্য কেবল দুই ঘণ্টা সময় ভিক্ষা করিতেছেন। কিন্তু নবাব সাহেব যদি তাঁহাকে সে ভিক্ষা দিতে না ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও তিনি অসন্তুষ্ট নহেন।"

নবাব সাহেব বলিলেন,—

"তা অবশ্য—তিনি যে যুদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কোমল দেহ বড়ই কাতর হইয়াছে সন্দেহ কি? তা বেশ। কিন্তু মনে থাকে যেন দুই ঘণ্টাও এ অধম সেবকের পক্ষে দুই যুগ।"

পান্না আবার বলিল,—

"এ পক্ষে দুই যুগেরও বেশী। কিন্তু দায়ে পড়িয়া

উভয়কেই একটু কষ্ট পাইতে হইল। বিশেষতঃ তাঁহার কপালে যে এমন সৌভাগ্য ঘটিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও মনে করেন নাই। তবে যখন এই আশার অতীত সুখ উপস্থিত হইতেছে তখন এ শুভ কার্য্যে যতদূর সম্ভব সমারোহ ও আনন্দ করিতে হইবে। রাণীজীর বড় দুঃখ যে তাঁহার লোক জন কেহ নাই; আমরা স্ত্রীলোক, সুতরাং আপনার ন্যায় বরের যেরূপ অভ্যর্থনা হওয়া উচিত তাহার কিছুই ঘটিবে না। তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যে ও এইরূপ অবস্থায় যতদূর সমারোহ হইতে পারে, তাহার কোনও ত্রুটি না হয়, ইহাই তাঁহার বিশেষ ইচ্ছা।"

নবাব সাহেব বলিলেন,—

"আমি তাঁহার নফর সুতরাং আমার জন্য কিছুই যেন তিনি মনে না করেন। এক্ষণে তাঁহার সন্তোষের জন্য তাঁহার এ ভাগ্যবান দাস এই অল্প সময়ের মধ্যে যতদূর আয়োজন হইতে পারে সকলই করিতে সম্মত আছে। কি তাঁহার অভিপ্রায় জানিতে পারিলে আমি তাহার উদ্যোগ করিয়া কৃতার্থ হই।"

পান্না আবার বলিল,—

"রাণীজীর ইচ্ছা অতি সামান্য। নবাব সাহেব অনুগ্রহ করিলে সে সাধ এখনই মিটিতে পারে। তাঁহার ইচ্ছা দুর্গের চারি নহবৎখানায় নহবৎ বাজে, আর নিকটের সমস্ত গ্রামে এই আনন্দ কার্য্যের সংবাদ দিয়া প্রজাদের ডাকিয়া আনা হয়, আর দুর্গের সমস্ত চূড়ায় পতাকার মালা উড়িতে থাকে, আর দুর্গের যে দিক নর্ম্মদা নদীর উপরে তাহা ভাল করিয়া সাজান হয়।"

নবাব বলিলেন,—

"এই মাত্র? তাহার জন্য চিন্তা কি? এ সকল এখনই করিয়া দিতেছি। তাঁহার জন্য জলে ডুবিতে, আগুনে ঝাঁপ দিতে যে দাস প্রস্তত আছে, সে এ কয়টী সুখের কাজ করিতে পারিবে না?"

তখন পান্না আবার,—

"নবাব সাহেব যদি এতই দয়া করিলেন, তখন আমরা আরও একটী কথা নিবেদন করি। নবাব সাহেব এখন যুদ্ধ সজ্জায় রহিয়াছেন। এরূপ মঙ্গল কার্য্যে, এমন আনন্দের সময়ে ও বেশটী ত্যাগ করিলে বড়ই ভাল দেখায়। আমরা এই দুই ঘণ্টার মধ্যে

আমাদের রাণীজীকে প্রাণ ভরিয়া সাজাইব! জাঁহাপনার রূপেই জগৎ আলো; তথাপি এই অবকাশে যুদ্ধের পোষাকটী বদলাইলে ভাল হইত না কি?"

জাঁহাপনা বলিলেন,—

"বড়ই ভাল হইত। আমার সঙ্গে কিন্তু পোষাক নাই। তাল সে জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা দেখিতেছি এবং যেমন ;করিয়া হউক, একটা পোষাক সংগ্রহ করিতেছি।"

পান্না বলিল,—

"সঙ্গে নাই বলিয়া ভাবনার কারণ কি? নবাব যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে এই দুর্গের পরিচ্ছদাগার হইতেই তাঁহার গায়ের মত পরিচ্ছদ পাওয়া যাইতে পারে। আপনার হুকুম পাইলে আমরা খুঁজিয়া বাহির করি।"

নবাব বলিলেন,—

"উত্তম। তবে শীঘ্র পাই যেন।"

পান্না বলিল,—

"এখনই আপনার নিকট পাঠাইয়া দিতেছি

আপনি কৃপা করিয়া আপাততঃ অন্যান্য আয়োজনে মনোযোগী হউন।”

নবাব বলিলেন,—

“হাঁ—সে ভাবনা করিতে হইবে না; সকলই ঠিক করিয়া দিতেছি! কিন্তু যতক্ষণ তোমার রাণীজীকে একবার দেখিতে না পাইতেছি, তাঁহার সঙ্গে একটা কথা না কহিতে পাইতেছি, ততক্ষণ অতৃপ্ত ভিক্ষুক যেমন দ্বার ছাড়ে না, আমিও তেমনই এ দ্বার ছাড়িতে পারিতেছি না। আমার মন প্রাণ সকলই রাণীজীর এই দ্বারে পড়িয়া রহিল, আমি তাঁহার আজ্ঞা পালনে চলিলাম। এ আল্লা! দুই ঘণ্টা কতক্ষণে ফুরাইবে?”

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
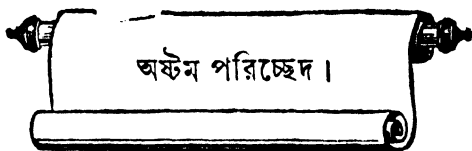
আজি গিরি-দুর্গে বড় সমারোহ। দুর্গের চূড়া সমূহে নানা বর্ণের সুরম্য কেতন সমূহ বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া পরম শোভা বিকাশ করিতেছে: চারিদিক্ হইতে নহবতের মনোহর ধ্বনি: বায়ু প্রবাহে নাচিতে নাচিতে ছুটিতেছে; দুর্গের যে দিকে পুণ্য-সলিলা নর্ম্মদা নদী কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছে, সে দিক্ পুষ্প ও পতাকা মালায় সুশোভিত। দুর্গের চতুর্দ্দিকেই সহস্র সহস্র নর-নারী, বালক ও বৃদ্ধ কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং পুরোভাগে আসিবার জন্য, পশ্চাতের লোকেরা সম্মুখের লোকদের ঠেলিতেছে। কৌতূহলাকৃষ্ট দর্শকগণের বদন কিন্তু বিষাদ কালিমায় সমাচ্ছন্ন—উদ্যম ও উৎসাহ বিহীন। আজি তাহাদের রাজ্ঞী, তাহাদের চির সম্মানিত রাজশোণিতের শেষ নিকেতন রাধা রাণীর বিবাহ। আজি তাহা-

দের চিরদিনের স্বাধীনতা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের চিরদিনের গৌরব আজি বিধ্বংসিত হইয়াছে। আজি এই দারুণ দুর্ভাগ্যের দিনে, আজি এই চিরন্তন অন্তর্দাহের সূত্রপাত সময়ে, তাহাদের রাজ্ঞীর বিবাহ। সে বিবাহ কাহার সঙ্গে? সেই বিজয়ী, তাহাদের সেই স্বাধীনতা বিলোপ-কারী, তাহাদের সেই মর্ম্মদাহকারী ম্লেচ্ছ ভূপালের সহিত তাহাদের রাণীর—তাহাদের সেই দেশের পরম পূজনীয়া অধীশ্বরীর আজ শুভোদ্বাহ! তাহারা এ সংবাদ যখন প্রথম শুনিয়াছে তখন আদৌ বিশ্বাস করে নাই—মনে করিয়াছিল এ অলীক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহারা সমবেত হইলে যবনেরা হয়ত তাহাদের অধিকতর সর্ব্বনাশ সংসাধিত করিবে। কিন্তু তথাপি তাহারা আসিয়াছে। রণক্ষেত্রে আত্মীয়-নাশ হেতু দারুণ বিয়োগ-ব্যথা ক্ষণেকের নিমিত্ত ভুলিয়া, আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন সর্ব্বনাশের ভাবনা ক্ষণেকের নিমিত্ত বিসর্জ্জন দিয়া, দেশের দারুণ দুঃখ-দুর্গতির আলোচনা ক্ষণেকের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিয়া, তাহারা আসিয়াছে; আসিয়াছে অনেক ভাবিয়া। তাহাদের

এত বিপৎপাতও রাধারাণীর এই অযোগ্য অপবিত্র পরিণয়ের তুলনায় নিতান্ত সামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর। এরূপ অবিশ্বাস্য কাণ্ড কখনই সংঘটিত হইবার নহে বলিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। সুতরাং এ ব্যাপার কি তাহা তাহারা জানিতে চাহে। আর যদিই ইহা সত্য হয়, তাহা হইলেও তাহারা আপনাদের চরম দুর্গতি স্ব স্ব চক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে চাহে। তাহারা দুর্ব্বল, তাহারা কাতর, তাহারা অক্ষম, তাই তাহারা রণক্ষেত্রে উপস্থিত হয় নাই। তাহাদের কোন সাধ্য না থাকিলেও, তাদৃশ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, তাহারা একবার অন্তিম চেষ্টা করিতে চাহে। তাই তাহারা আসিয়াছে। তাহারা জানে এই দুর্গে তাহাদের রাণী আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে আসিয়া দেখিল দুর্গ উৎসবময়, আনন্দময় এবং শোভাময়। তাহাদের আহত, ব্যথিত, নিপীড়িত হৃদয় আরও আশঙ্কা সংকুলিত ও অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। যে সংবাদ সর্ব্বথা অসম্ভব বলিয়া তাহারা জ্ঞান করিয়াছিল, উপস্থিত অনুষ্ঠান দেখিয়া, তৎসম্বন্ধে তাহারা বিশিষ্টরূপ সন্দিহান হইল সেই বিষণ্ণ, ব্যাকুল, উৎকণ্ঠাকুল, দর্শকগণ,

সভয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে, দুর্গাভিমুখে নেত্রপাত করিল এবং সকলেই দুর্গ দেখিতে পাইবার জন্য, উৎসুক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কিন্তু বাহিরের কথায় আমাদের কাজ কি? দুর্গাভ্যন্তরে—যেখানে বিবাহোৎসবের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে, সেই স্থানের কথাই এখন প্রধান আলোচ্য। সেই সুবৃহৎ প্রকোষ্ঠ আজি সুসজ্জিত। শ্বেত, লোহিত, পীত পুষ্প মালিকায় সে গৃহ সুশোভিত, মনোহর গন্ধ দ্রব্যের সুগন্ধে সে প্রকোষ্ঠ আমোদিত, হৃদয়োন্মাদকারী বিলাস দ্রব্যে তাহা পরিপূরিত। কিন্তু তাহা জনশূন্য। আরবীয় নৈশকাহিনী বর্ণিত, পরিত্যক্তা সুন্দরী পুরীর ন্যায়, এই প্রকোষ্ঠ অধুনা জন হীন; কিন্তু বিধবা সুন্দরী যুবতীর ন্যায় দুর্দ্দশা এ প্রকোষ্ঠকে অধিকক্ষণ ভোগ করিতে হইল না। ভাগ্যবান ভূপতিগণের অগ্রদূত কণ্ঠোত্থিত চীৎকার ধ্বনির ন্যায়, অচিরে অলঙ্কার শিঞ্জিত, কোন নবীনা নারীর সমাগম সংবাদ, অগ্রে ঘোষণা করিতে লাগিল; সেই সঙ্গে সঙ্গেই চুণী সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। তাহার আজি কি মনোহর বেশ, কি অপূর্ব্ব

সজ্জা! আজি তাহার দেহ অলঙ্কারে খচিত। চুণী আসিয়া, প্রকোষ্ঠের চারিদিক্ এক বার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, আবার প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে পান্নাকে সঙ্গে লইয়া তথায় পুনরাগতা হইল। চুণীর ন্যায় পান্নাও আজি সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিতা।

প্রকোষ্ঠমধ্যে প্রবেশ করিয়া চুণী পান্নাকে বলিল,—

"এদিকের তো সব ঠিক, এখন বরকে ডাকিয়া আন।"

পান্না বলিল,—

"আর বার ভাই তোমাকে একটী কথাও কহিতে হয় নাই। এবার সব কাজ তোমায় করিতে হইবে।"

চুণী বলিল,—

"এমন সুখের কাজ করিব তাহার আর চিন্তা কি?"

চুণী সোপান বহিয়া প্রস্থান করিল এবং অবিলম্বে নবাব সাহেবকে সঙ্গে লইয়া আসিল; নবাব সাহেবের বরবেশে, আজি বেশ-ভূষার সীমা কি? রাধারাণীর পরিচ্ছদাগার হইতে সযত্নে নির্ব্বাচিত, অতি মূল্যবান পরিচ্ছদ তাঁহার অঙ্গ আবরণ করিয়াছে। তাঁহার মস্তকে মহামূল্য তাজ, তাঁহার কণ্ঠে হীরক-মালা,

তাঁহার শ্মশ্রুরাজি আজি সযত্ন বিন্যস্ত। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ ছাড়াইয়াছে বটে, কিন্তু তিনি আপনাকে বিংশ বর্ষীয় যুবা সাজাইবার জন্য আজি কোন প্রযত্নের ত্রুটি করেন নাই! তিনি আসিবা মাত্র, পান্না তাঁহাকে বার বার বিনম্র অভিবাদন করিয়া অতি সমাদরে তত্রত্য এক পর্য্যঙ্কে বসাইল এবং বলিল,—

"আমাদের রাণীজী—রাণীজীই বা কেন?—এখন হইতে বেগম সাহেব—আমাদের বেগম সাহেব এই শুভ ঘটনার জন্য যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছেন তাহা আমরা জাঁহাপনাকে বলিয়া ফুরাইতে পারি না। তিনি আজ যে কতই সাজ পোষাক করিতেছেন তাহার আর কি বলিব?"

নবাব সাহেব অবশিষ্ট কথা শুনিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—

"কিন্তু কোথায় তিনি? আমার প্রাণ যে তাঁহার জন্য ছট্ ফট্ করিতেছে! দুই ঘণ্টা কি এতক্ষণেও হয় না? এমন করিয়া আর কতক্ষণ থাকিব?"

চুণী হাসিয়া বলিল,—

"জাঁহাপনা! আমারাই রাণীজীর মরণ কাঠি, বাঁচন

কাঠি, এ কথা, বোধ হয়, আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন। আমরা মনে করিলে এখনই তাঁহাকে আপনার কাছে আনিয়া দিতে পারি। কিন্তু আমরা তা করিব কেন? পরের সুখের জন্য আমদের এত দায় কি? যাদের গরজ তারা বুঝুক।”

তখন নবাব সাহেব, করযোড়ে পর্য্যায়ক্রমে উভয় সখীর প্রতি কাতর ভাবে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, বলিলেন,—

“তোমরাই সকল বিষয়ের মূল মন্ত্রী, তোমরাই রাণীজীর দক্ষিণ ও বামহস্ত, তাহা কি আমি জানি না? তোমরা এ গরিবের উপর একটু দয়া কর, নহিলে আমার প্রাণ যায়। কোথায় রাণী? চল আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া চল। ঘোর সন্নিপাতের তৃষ্ণা—অথচ সম্মুখে এমন সুশীতল জল, তোমরা তাহা খাইতে দিবে না। তোমাদের পায়ে পড়ি ভাই, তোমরা আমার প্রতি একটু দয়া কর।”

চুণী বলিল,—

“সন্নিপাতের তৃষ্ণাই বটে। তবু এখনও ঔষধ ভাল করিয়া ধরে নাই, এর পরে আরও টের পাবেন।

আচ্ছা ভাই পান্না, নবাব সাহেবকে আর কষ্ট দেওয়া ভাল নয়। চল ভাই, আমরা রাণী দেবীকে ডাকিয়া আনি।”

তাহারা প্রস্থান করিল। নবাব একখানি রুমাল লইয়া ধীরে ধীরে আপনার বদনে বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং, সতৃষ্ণ নয়নে, যে দিকে সখীরা গিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ধীরে ধীরে, অবনত মস্তকে, রাজ-রাজমোহিনী রাধা-রাণী, সখিসঙ্গে, সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র নবাব সাহেব অবাক্ হইয়া গেলেন! সেরূপ অপরূপ রূপ, সেরূপ অপার্থিব লাবণ্য, সেরূপ সুঠাম সৌকুমার্য্য নবাব সাহেব আর কখন কোথায় দেখেন নাই। তাঁহার প্রবীণ নয়ন হইতে তখন নবীন যুবার ন্যায় জ্যোতিঃ বাহির হইতে লাগিল এবং, এই সুন্দরী অতঃপর তাঁহার হইল ভাবিয়া, তিনি তখন মনে মনে ঈশ্বরকে শত ধন্যবাদ দিতে লাগি-লেন। রাধার আজি কি ভুবনমোহন বেশ! আজি তাঁহাতে উজ্জ্বলে উজ্জ্বলে সমুজ্জ্বল সম্মিলন সংঘটিত হইয়াছে। উজ্জ্বল তাঁহার নয়ন জ্যোতিঃ, উজ্জ্বল তাঁহার

দেহের আভা, উজ্জ্বল তাঁহার ঈষৎ হাস্য, উজ্জ্বল তাঁহার পরিধান বস্ত্র এবং উজ্জ্বল তাঁহার হীরক ভূষণ। রূপোজ্জ্বলিতা রাধা সন্নিহিত অন্য এক পর্য্যঙ্কে সমাসীন হইলেন। এতক্ষণে নবাব সাহেবের বাক্য কথনের ক্ষমতা হইল। তিনি তখন বলিলেন,—

"সুন্দরি, তোমাদের রীত্যনুসারে মাল্য পরিবর্ত্তন করিয়া তোমার এ দীন নফরকে চরিতার্থ কর। অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছি, আর অপেক্ষা করিতে আমি সম্পূর্ণই অক্ষম।"

রাধা, নবাবের প্রতি বঙ্কিম দৃষ্টিপাত করিয়া, চুণীকে বলিলেন,—

"সখি, নূতনের প্রতি পুরুষের কেমন আশ্চর্য্য অনুরাগ তাহা যদি বুঝিতে চাহ, তবে এই নবাব সাহেবের দৃষ্টান্ত দেখ, তাহা হইলেই সব বুঝিতে পারিবে। নবাব সাহেবের আজি আমার প্রতি কত অনুরাগ তাহা দেখিতেছ। কিন্তু আজি আমি উহাঁর দাসী হইলে. কালি প্রাতেই হয় ত উনি আমার কথা ভুলিয়া যাইবেন। যদিই আমার কপাল-ক্রমে কালই আমাকে না ভুলেন, তাহা .হইলে দুই তিন দিনে বে

আমার কথা একেবারেই ভুলিয়া যাইবেন, তাহার আর কোন সন্দেহই নাই।"

নবাব সাহেব রুমাল নাড়িয়া বাতাস খাইতেছিলেন, কিন্তু, অধিকতর গ্রীষ্ম বোধ হওয়ায়, বলিলেন,—

"এখানে বাতাস করিবার কোন লোক আসিতে পারে না কি? বড় গ্রীষ্ম।"

চুণী বলিল,—

"লোকে প্রয়োজন? আমরা দাসী—নবাব সাহেবের শ্রীঅঙ্গে বায়ু-বীজন করিয়া আমরাই কৃতার্থ হই।"

এই বলিয়া চুণী নবাবকে বীজন করিতে লাগিল। নবাব বলিলেন,—

"রাজ্ঞি, আমার প্রণয় এত শিথিলমূল কেন মনে করিতেছেন? আমি আপনার চরণে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া চিরদিন আপনার দাস হইয়া থাকিব।"

নবাব সাহেব, বিজাতীয় গ্রীষ্ম-জ্বালা অনুভব করিয়া, প্রথমে মস্তকের উষ্ণীষ, পরে অঙ্গাবরণের বন্ধনী মোচন করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—

"কি ভয়ানক গরম!"

পান্না আর একখানি পাখা লইয়া নবাবকে বীজন করিতে আরম্ভ করিল। তখন রাধা বলিলেন,—

"কিন্তু নবাব সাহেবের এই প্রথম নারীলাভ নয়। ইহার পূর্ব্বে শত শত বার এমনই নারীলাভ করিয়াছেন এবং শত শত বার এইরূপে চিরদাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সে সকল দাসত্ব কতক্ষণ ছিল?"

নবাব সাহেব, এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া, বলিলেন,—

"কি ভয়ানক গ্রীষ্ম-জ্বালা। অসহ্য! প্রাণ যায় যে! সখি! এখানে একটু শীতল জল পাওয়া যায় কি?"

পান্না দৌড়িয়া শীতল জল আনয়ন করিল। নবাব সাহেব তখন গা খুলিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি উভয় হস্তে শীতল জল লইয়া অঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন; তাহার পর বলিলেন,—

"কিন্তু এ জ্বালা তো যায় না সুন্দরি! এ জ্বালার কারণ তুমিই। তোমার ঐ চন্দনাক্ত কোমলাঙ্গ স্পর্শ করিলেই আমার এ জ্বালা যাইবে।"

রাধা বলিলেন,—

"জাঁহাপনা, ব্যস্ত হইবেন না। আমি তো সম্মুখেই আছি।"

নবাব দীর্ঘ-নিশ্বাস সহ বলিলেন,—

"একি জ্বালা! এককালে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। চতুরে! আর তোমার কথায় ভুলিব না। ওঃ প্রাণ যায় যে! চারিদিক্ অন্ধকার কেন? সুন্দরি! যতক্ষণ তোমাকে আলিঙ্গন করিতে না পাইব, ততক্ষণ এই জ্বালা ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে। কই তুমি? একি অন্ধকার যে!"

সুন্দরীর সমীপস্থ হইবার বাসনায় নবাব আসন ত্যাগ করিলেন, কিন্তু যেমন তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, অমনই কম্পান্বিত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন এবং ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—

"সুন্দরি! কোথা—তুমি? ওহো!—কি জ্বালা!"

তখন রাধা উন্মাদিনী ভাবে বলিলেন,—

"ইন্দ্রিয়পরায়ণ পশু! এ সংসারে আর ও জ্বালার নিবারণ নাই। তোমাকে যে পরিচ্ছদ দিয়াছিলাম, তাহার সর্ব্বত্রে বিষ মাখা ছিল। সেই বিষ এতক্ষণে তোমাকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। জানিও হৃদয়হীন

দস্যু! কোন উপায় যখন না থাকে, রাজপুতাঙ্গনা তখন এইরূপে শত্রু নিপাত করিয়া আপনার জাতি, ধর্ম্ম, কুল, মান সকলই বজায় রাখিতে পারে।"

তাহার পর চুণী ও পান্নাকে বলিলেন,—

"এখন তোমরাও পথ দেখ।"

তাহারা তৎক্ষণাৎ হস্তস্থিত বিষ-প্রস্তর লেহন করিতে আরম্ভ করিল।

কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাধা, তীরবৎ বেগে সেই প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিয়া, তাহার এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলে, তাঁহার কাতর প্রজাপুঞ্জ, তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"জয় রাধারাণীকী জয়!"

রাধারাণী অত্যুচ্চ স্বরে বলিলেন,—

"তোমরা আজ প্রাণ ভরিয়া জয়ধ্বনি কর, আজ আমার বিবাহ!"

তাহার পর উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন,— "গুরুদেব, আপনার আজ্ঞা পালন করিয়াছি। কুলে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পায় নাই। কৌশলে প্রধান শত্রু নিপাত করিয়াছি।"

তাহার পর উভয় হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বলিলেন,—

"প্রাণেশ্বর! হৃদয়দেবতা! আজি আর কিসের ভয়? তুমি নিশ্চয়ই সময়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছ এবং এতক্ষণ স্বর্গলোকে গিয়া, আমাকে কতই নিন্দা করিতেছ। এই যে তোমার দাসী ও তোমার সঙ্গিনী হইতে চলিল!"

নিম্নে নর্ম্মদা-নীর দুলিতে দুলিতে বহিতেছিল। কথা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নবীনা, পরমা শোভাময়ী, উৎফুল্লাননী রাধা সবেগে সেই জলে নিপতিত ও নিমগ্ন হইলেন। অপর পারের অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ হইতে প্রায় সম সময়েই আর এক ক্ষীণ ও কাতর যুবা—

"প্রাণেশ্বরি! আমাকে ফেলিয়া কোথা যাও। আমি যে এখানে?"—

বলিয়া সেই নদী-প্রবাহে ঝম্প প্রদান করিল। সেই যুবক কিষণলাল। ইহ জগতে সেই দিন হইতে আর কেহ সে যুগলকে দেখিল না।

সম্পূর্ণ।

প্রেম-পরিণাম।

(গদ্য কাব্য।)

সোদর-প্রতিম আত্মীয়

গুণগ্রাহী

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায় এম এ, বিএল্,

মহাশয়ের করকমলে

সাদরে

সমর্পিত হইল।

বিজ্ঞাপন।

১২৮৪ সালের "আর্য্যদর্শনে" এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতদিন পরে, একজন বন্ধুর আগ্রহাতিশয্য হেতু, ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

ইহা কোন প্রয়োজনে আসিবে কি না, বলিতে পারি না।

শ্রীদামোদর দেবশর্ম্মা।

প্রেম-পরিণাম।

(গদ্য কাব্য)

প্রথমাংশ—আশা।

নায়ক ও কোকিল।

সেই গীত আবার গাও দেখি। আবার সেই মধুর তানে এ দগ্ধ হৃদয়ে অমৃত সঞ্চার কর দেখি। আর একবার এই ভীষণ ধরণীতে সেইরূপ বসন্তের আবির্ভাব করাও দেখি। বিশুষ্ক পাদপে পুনরায় রূপের প্রসূন ফুটাও দেখি। আবার সেই গীত গাও দেখি। সে গীত কই? কই কোকিল, তোমার গীতে সে অমৃত-সঞ্চারিণী শক্তি কই? কই বসন্ত কই? সে অতুলনীয় সম্মোহন সৌন্দর্য্য কই? এ গীতে সে

গীতত্ব কই? আমার সে, যে গীত-ধ্বনিতে এ বিশ্ব-সংসার আপ্লাবিত করিত, কোকিল তোমার গীতে সে মাধুর্য্য কই? দেখিলাম সে মাধুর্য্য তোমার গীতে নাই। বুঝিলাম সে মাধুর্য্য আবির্ভাব করাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই। সে মাধুর্য্য সে ভিন্ন আর কাহাতেও নাই। তবে তাহার জন্ত ভাবি কেন? তাঁহাই মনে পড়ে কেন? মনে পড়ে কেন, ভুলিতে পারি না কেন, তাহার কি উত্তর দিব? এ দগ্ধ হৃদয় জানে না তাহার কি উত্তর।

সেই সুন্দরী, সেই ভুবনমোহিনী,—সে যেমন গাইত তেমন গীত আর শুনিলাম না। জগতে তেমন অপূর্ব্ব সংগীত আর কাহারও কণ্ঠ হইতে বিনির্গত হয় না। কিন্তু সে গাইত, তাহাতে আমার কি? সে আমার কে? তাহার চিন্তা আমায় ত্যাগ করে না কেন? সে সুমধুর সংগীতধ্বনি এ মানব-বিহীন ঘোরারণ্য মধ্যেও আমার অন্তর ভুলে না কেন? সে পাপ-স্মৃতি আজিও পোড়ায় কেন? যে ব্যক্তি বাসনা-বিহীন, সংসারত্যাগী, পুণ্যাশ্রম-বাসী, কি পাপে, হে ভগবন্! তাহার হৃদয়কে এ অনন্ত কালানলে দগ্ধ করিতেছ?

সব ত্যাগ করিয়াছি, বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়াছি, সংসারের কোন সুখেই তো লক্ষ্য নাই; তবে ভগবন্! এ স্মৃতি কেন ত্যাগ করিতে পারি না? এই নিবিড় জটাভার, এই বল্কল, এই ভস্ম, এই কমণ্ডলু, এই সব অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—এরাও কি সেই মত্ত স্মৃতির বেগ ফিরাইতে পারে না? ঐ প্রস্রবণের জলে যে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে শিখিয়াছে, ঐ বৃক্ষ লতাপ্রসূত ফল-মূলে যে উদর-জ্বালা খর্ব্ব করিতে অভ্যাস করিয়াছে, ঐ বিস্তৃত বিটপীর ছায়ায় শয়ন করিয়া যে তৃপ্ত হইতেছে, ঐ শুষ্ক তৃণ, পত্র ও লতা যাহার সুকোমল শয্যার অভাব পূরণ করিতেছে, সংক্ষেপতঃ যে ব্যক্তি সংসারের সমস্ত মোহ ও লালসা বিস্মৃত হইতে শিখিয়াছে, সে কেন এ পাপ-স্মৃতি ত্যাগ করিতে পারে না?

সেই গীত। সেই গীত আবার শুনিব এ আশা প্রাণান্তেও বিসর্জ্জন দিতে পারি না। সেই মধুময় কণ্ঠ-নিঃসৃত অমৃতময় সংগীত ধ্বনি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। ভুলিতে চেষ্টা করিলাম, ভুলিতে পারিলাম না তো। এখনও সেই গীত কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। সে গীত-ধ্বনি ভুলিতে পারিব না।

কিন্তু কোকিল! তোমারই গীত ভাল। ভাল কেন বলি? তোমার গান তোমার সরল প্রাণ হইতে উদ্ভূত। তোমার গানে কোন মানবীয় শঠতা নাই। তোমার গান তো পর মজাইবার গান নহে। তোমারই গান ভাল। আর সেই যে গান কোকিল—ওঃ কি ভয়ানক! হায়! অমৃতে বিষ থাকিবে তাহা কে ভাবিয়াছে? কুসুম, দেব-সেবায় না লাগিয়া, কীটের নিবাস-ভূমি হইবে তাহা কে মনে করিয়াছে? কে জানে কুসুম-কানন কণ্টকাকীর্ণ? কে জানে অমন ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য নিদারুণ কপটতার আকর?—ওঃ তার সেই যে গান কোকিল, তার সেই যে অতুলনীয় গান—আঃ! আর কি এ পাপ শ্রবণে তাহা পশিবে? এ জীবনারণ্যে সে সুখ-মারুত-হিল্লোল বহিবে না, এ পাপ সরোবরে সে পবিত্র কমল ফুটবে না, এ অন্ধকার গৃহে সে জগজ্জীবন জ্যোতিঃ দেখা দিবে না,—সে গান এ জীবনে আর শুনিব না। আর শুনিব না, তাহাতে দুঃখই বা কি? সে গীত শুনিয়া সুখ কি? সে পাপ গান শুনিয়া কাজ কি? হায়! যাহাতে হৃদয় নাই, যাহাতে সরলতা নাই, যাহাতে স্বভাবের বিকাশ নাই, যাহাতে আবেশ নাই, যাহার

স্বীয় গতি নাই, তাহা পাপ; তাহা পাপ হইতেও পাপ। আমি কি পুনরায় সেই পাপের জন্য কাঁদিতেছি। ধিক্ আমাকে! তাহা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

কিন্তু সে কেন অমন হইল? সে কেন "বিষকুম্ভঃ পয়োমুখঃ" হইল? সে ভূলোক-দুর্ল্লভ সৌন্দর্য্য-সাগরে কেন পাপ কীটের নিবাস হইল? সেই মধুমাখা কথার সঙ্গে কেন সরলতার সিঞ্চন থাকিল না! সে কেন অমন হইল? এই যে আমি তাহার জন্য সংসার-ত্যাগী ঘোরারণ্য-বাসী হইয়াছি; এই যে আমি তাহার জন্য, এই জন-সমাগম-শূন্য-অরণ্যে বসিয়া, অলক্ষিত ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি, সে কি তাহা ভাবিতেছে? সে পাপীয়সী, সে হয়ত এখন সুখে ও ভোগ-বিলাসে প্রমত্ত আছে। হয়ত পাপীয়সী এখন, তাম্বূল রাগ-রঞ্জিত অধর চাপিয়া, প্রবদ্ধমান হাস্যের বেগ মন্দীভূত করিতেছে! আমার অবস্থা সে পাপীয়সী ভ্রমেও ভাবিতেছে কি? তাহার হৃদয় কলুষরাশিতে আপ্লাবিত। সে কেন এমন হইল?

মানব হৃদয় এত জঘন্যতার জন্মভূমি তাহা ভ্রমেও মনে ভাবিতে ইচ্ছা হয় না। নরকের পুরীষরাশিতে মানব-হৃদয় গঠিত এ সিদ্ধান্ত যখন মনে উদয় হয়, তখন

স্বতঃ হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কিন্তু একের পাপে সাধারণের প্রতি দণ্ড-বিধান ন্যায় ও নীতির বহির্ভূত। সেইই মন্দ, তাহারই আত্মা বিষে পরিপূর্ণ, তাহারই অন্তর পাপের আলয়, তাহারই জীবন জঘন্যতার আধার; কিন্তু সে জন্য আজি আমি জন-সাধারণকে দোষী করি কেন? একের পাপে অন্যের প্রতি কটূক্তি সুরুচি ও সদ্বিবেচনার কার্য্য নহে। কি জানি আমার একি ভ্রম। কি জানি আমাকে কি ঘোর দুর্নিবার ছন্নমতিতে গ্রাস করিল! আজি তাহার যত কথা আলোচনা করিতেছি, তাহার সেই যাতনা-প্রদ ব্যবহার যত মনে করিতেছি, তাহার সেই ভ্রান্তি-সম্ভাবনা-বিরহিত কার্য্য-কলাপ যত মনে ভাবিতেছি, ততই যেন মানব-সাধারণের প্রতি আমার চিরদিনের শ্রদ্ধা অন্তরিত হইয়া যাইতেছে। ততই যেন বোধ হইতেছে, এ সংসার পাপ, তাপ ও ক্লেশের আধার। ততই যেন বোধ হইতেছে, মানব মাত্রেই ঘোর নারকী। ততই যেন বোধ হইতেছে, এ জগতে সহানুভূতি নাই, প্রীতি নাই, প্রেম নাই। ভালবাসা মুখের কথা। প্রণয় সে কেবল কবির কল্পনা, নিদ্রিতাবস্থার নিষ্ফল স্বপ্ন, মরুভূমির মরীচিকা, মিছা কথা। হায়! যখনই তাহার কথা মনে হয়—যখনই বা

মনে না হয়—কখনই বা সে কথা ভুলিতে পারি—যখনই তাহার কথা মনে হয়, তখনই, এ জগতে মানব সৃষ্টি করিয়া স্রষ্টার কি লাভ হইল, এ সম্বন্ধে ঘোর তর্ক মনোমধ্যে উপস্থিত হয়। এ পাপ, তাপ ও ক্লেশ ভুগিতে, জগতে মানব নামক জঘন্য জীব-সৃষ্টির প্রয়োজন কি? এ সংসার কেন একদিনে অনন্ত সাগর-গর্ভে বিলীন হউক না; দারুণ মহামারী উপস্থিত হইয়া কেন একদিনে সমস্ত মানব-বংশ ধ্বংস করুক না; একদিনে কেন আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হউক না। মানব হৃদয়হীন, মানব পশু অপেক্ষাও অধম জীব; এ অবনীতে মানব থাকিয়া কাজ নাই।

কিন্তু কোকিল! তাহার যে এত কুৎসা তোমার কাছে বলিতেছি, বলিতে কি, কি জানি কেন, এখনও তাহার জন্য প্রাণ কাঁদিতেছে; এখনও অন্তর, তাহাকে ভাবিতে ভাবিতে, হু হু শব্দে জ্বলিতেছে। যাই বল কোকিল! তাহার নিন্দা করিতে আমার যে কষ্ট হইতেছে, তাহা আমিই জানিতেছি। আর কে জানিবে? কে এ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া তথায় শান্তিবারি সিঞ্চন করিবে? যে শান্তি দিবে, যে তাহা

দিলে দিতে পারে, সে তথায় যন্ত্রণার জ্বলন্ত শিখা এত প্রবর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছে যে, চিতার অনলে ভিন্ন আর শান্তির আশা নাই। তবে কে আর শান্তি দিবে? আর কাহার নিকট হইতেই বা আমি তাহার প্রত্যাশা রাখি? এ জগতে আমার এই নিদারুণ যাতনার কি শান্তি আছে? আমার এ ব্যাধির কি ঔষধ আছে? আমার এ যম-যন্ত্রণার শান্তি জ্বলন্ত চিতায়। আমার এ দারুণ ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ মৃত্যু-মুখে।

এ অপরিমিত যাতনা-রাশি ভুগিতে ভুগিতে, দিনে দিনে, তিল তিল করিয়া মৃত্যুর অপেক্ষা, একদিনে মরা ভাল নয় কি? এ কষ্ট অপেক্ষা মরাই ভাল। এ কষ্ট আর সহিতে পারি না। এ ভারভূত জীবন রক্ষা করা অপেক্ষা শীঘ্রই ইহার বিনাশ-সাধন করায় দোষ কি? এক শ্রেণীর লোক আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া মনে করেন! নিশ্চয়ই এ নিদারুণ ক্লেশ তাঁহাদের এক দিনও ভুগিতে হয় নাই, এ সংসারে এরূপ যম-যন্ত্রণা তাঁহারা একদিনও জানিতে পারেন নাই। যদি এই অপরিমিত দুঃখরাশি দিনেকের নিমিত্তও সহিয়া, তাঁহারা আত্মহত্যার বিরোধী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়ের প্রশংসা করিতে

পারি না। তাঁহারা দারুণ হৃদয়হীন। নচেৎ তাঁহারা যাতনা-ক্লিষ্ট মানবের এই মহাশান্তির বিরোধী কেন? তাঁহাদের কথায় আর কর্ণপাত করিয়া কাজ নাই। আমার পক্ষে মরণই মঙ্গল। আমি আমার এই ঘোর যাতনা সঙ্কুল জীবনের এই স্থানেই উপসংহার করিব। আমি আত্মহত্যা করিব। তুমি দার্শনিক! এ ব্যবস্থা যদি তুমি মহাপাপ বলিয়া মনে কর, তুমি আমার অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করিয়া দেও। আমার যাতনার শান্তি নাই, এ যাতনা নিবারণের অনুরূপ ব্যবস্থা নাই। অতএব আমার পক্ষে আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ। যদি তাহাতে পাপ থাকে—হাত নাই। সে পাপের ভয়ে আমি কাতর নহি। যিনি জীবন দিয়াছেন, তিনি আমার পক্ষে করুণাময় নহেন। আমার জীবন সম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় মঙ্গলময় নহে। যে নিরীহ প্রাণী দুর্ব্বহ দুঃখ-ভারে উৎপীড়িত, জীবন যাহার পক্ষে যন্ত্রণার আলয়, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার হৃদয়ে ঘটনাচক্র, অনন্ত গরলরাশি ঢালিয়া, অসহ্য যাতনা দিতেছে, স্রষ্টা তাহার পক্ষে করুণাহীন। সে আর স্রষ্টার বিচারের প্রশংসা করিতে পারে না। বিচার-বিহীন পক্ষপাতী স্রষ্টার

ভয়ে সে ভীত নহে। আমার এ অবস্থায়, মরণে যদি পাপ থাকে, আমি সে পাপে প্রস্তুত আছি। পাপে আমার কি হইবে? পাপ-পুণ্যের কি বিচার আছে? যদি পাপ পুণ্যের বিচার থাকিত, যদি জগতে ন্যায়ের শাসন থাকিত, তাহা হইলে অভাগার এ দারুণ দুর্দ্দশা হইত না, তাহা হইলে এ হতভাগা মৃত্যুর প্রার্থনায় এত ব্যগ্র হইত না, তাহা হইলে কখনই মানবসমাজে এত বৈষম্য লক্ষিত হইত না। এ জগতে হিতাহিত, ন্যায় অন্যায়ের বিচার নাই। এ জগৎ পাপের পুরী। এখানে পুণ্যাপেক্ষা পাপের জয় দেখিতে পাই, এখানে ন্যায় অপেক্ষা অন্যায়ের আদর দেখিতে পাই, এখানে ভাল অপেক্ষা মন্দের সুখ দেখিতে পাই। কে বলে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্? কে বলে ঈশ্বর করুণাসিন্ধু? যে বলে সে ভ্রান্ত। এ পাপময় জগতে কাহার নিকট বিচারের প্রার্থনা করিব, কাহার কাছে দুঃখ জানাইব? এখান হইতে যত শীঘ্র অবসর লওয়া যায় ততই মঙ্গল। মৃত্যুই আমার একমাত্র প্রার্থনা। আমি এ জীবন আত্মহত্যা দ্বারা বিছিন্ন করিব।

মরিব বটে, মরিলে যাতনা যাইবে বটে, কিন্তু কোকিল! মরিলে তাহার সহিত আর কখন বারেকের

নিমিত্তও সাক্ষাতের আশা থাকিবে না। সে সহস্রবার মন্দ হউক, তথাপি তাহাকে দেখিলে যে সুখ পাই, তাহা কাহাকে বুঝাইব? সেই যে হাসি হাসি মধুরিমাময় মনোহর মুখ খানি, তাহা আর একবার দেখিবার আশা এ জীবনে ত্যাগ করিতে পারিব না। সেই যে বীণা-বিনিন্দিত মধুর স্বরে অমৃতবৎ এক একটী ভুবন দুর্লভ কথা, তাহা যদি আর একবার শুনিতে পাই, তাহা হইলে তাহার সহিত সংসারের সমস্ত সুখ বিনিময় করিতে স্বীকৃত আছি। তাহাকে দেখিবার আশা ত্যাগ করিয়া মরিতেও পারিব না। না—এ যাতনা সহিব সেও ভাল, তথাপি সে আশা ত্যাগ করিয়া মরিব না। মরিয়া বাঁচা আমার অদৃষ্টে নাই, মরণের বিনিময়ে চিরশান্তি ক্রয় করা আমার কপালে নাই—এ যম-যন্ত্রণা আমার নিয়তি।

তাহার সহিত সাক্ষাৎ করার সুখ কি? সুখ কি তাহা জানি না; কিন্তু এ পাপ তৃষ্ণা, এ পাপ আশা তো নিবারিত হয় না। হৃদয় তো তাহাকে একবারও ভুলে না। কল্পনা তো একবারও তাহার চিত্র অন্তর হইতে অপনীত করে না। আমি এত কথা কহিতেছি, এত দুঃখের কান্না কাঁদিতেছি, এত প্রলাপ বকিতেছি, তাহার

এত নিন্দা করিতেছি, তথাপি কই দুষ্ট কল্পনা তো একবারও তাহাকে ভুলিল না। কল্পনা দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, সেই পাপীয়সীর বহুবিধ মূর্ত্তি, সুরঞ্জিত করিয়া, আমার সম্মুখে সমানীত করিতেছে। ঐ যেন দেখিতেছি, পাষাণী স্বর্ণহীরকাদি বিনির্ম্মিত অলঙ্কারে স্বীয় পাপ অবয়ব বিশোভিত করিয়া, সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত দর্পণে স্বীয় ঘৃণিত অবয়বের পূর্ণায়ত প্রতিবিম্ব দেখিতে দেখিতে, বিম্বোষ্ঠের প্রান্ত দিয়া, ভুবনমোহন হাস্যের তরঙ্গ, একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। ঐ যেন দেখিতেছি, হৃদয়হীনা আগুল্‌ফবিলম্বিত বিশৃঙ্খল চিকুরদাম দুলাইতে দুলাইতে, প্রাসাদসংলগ্ন মনোহর পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে এবং সময়ে সময়ে হস্তস্থিত প্রিয় পাপিয়া পক্ষীর চঞ্চুপুট চুম্বন করিতেছে। ঐ যেন দেখিতেছি, পাষাণী, বনদেবীর ন্যায়, পুষ্প-লতিকা দ্বারা মোহিনী সজ্জা করিয়া, বৃক্ষবাটিকার বকুল মূলে বসিয়া, "কপালকুণ্ডলা" অধ্যয়ন করিতেছে। ঐ যেন দেখিতেছি, হতভাগিনী সায়ংকালে প্রাসাদোপরে উপবেশন করিয়া, পাগলিনীর ন্যায়, আকাশের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে এবং হাসিতে হাসিতে সময়ে সময়ে পার্শ্বস্থ বালককে জিজ্ঞা-

সিতেছে, “বল দেখি, মেঘ আগে যাবে, কি চাঁদ আগে যাবে?” কতরূপে তাহাকে সতত যে মানস-নেত্রে সন্দর্শন করিতেছি, তাহা আর কত বলিব? কি ভয়ানক! অসহ্য! এ পাপস্মৃতি কেন যায় না? কবি যথার্থই বলিয়াছেন,

“ভুলিব ভুলিব করি ভোলা নাহি যায়,
যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে।”

ইত্যাদি।

এ পাপ স্মৃতি—এ দুষ্ট আশা—এই দুই গেলেই আমার এ ঘোর যাতনার তো অবসান হয়। স্মৃতি যায় না—আশা যাইবে কেন?

আশার দৌরাত্ম্যে মরিয়া শান্তি লাভ করাও অভাগার অদৃষ্টে ঘটিল না। আশার পরামর্শেই আমার সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে। বিশেষ বুঝিতেছি যে, ভ্রান্ত আশা পোষণ করিতেছি,—জানিতেছি, পাষাণে অঙ্কপাত করা সহজ নহে। চিরকাল জানি, লৌহ সহজে বিগলিত হয় না; চিরদিন বুঝি, স্রোতের বেগ ফিরান অনায়াস-সাধ্য নহে; তথাপি কি জানি কেন, এ পাপ আশাকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারিতেছি না। এত ভাবিতেছি যে, ভ্রান্ত আশার উন্মত্ত প্রলাপে আর কর্ণপাত করিব

না; এত ভাবিতেছি যে, প্রমত্ত কল্পনার জঘন্য চিত্রে আর দৃষ্টিপাত করিব না; এত ভাবিতেছি যে, স্মৃতির অস্বাভাবিক বর্ণনায় আর কর্ণপাত করিব না; তথাপি কি জানি আমার একি দুর্ব্বলতা, আমি পুনঃ পুনঃ প্রতিনিয়ত তাহাদের অধীনতায় বদ্ধ হইতেছি। আশার কি অসাধারণ মন্ত্র-বিদ্যা! আশা সতত এই যাতনাক্লিষ্ট হতভাগাকে স্বর্গের সুখ দিতে প্রস্তুত। স্বপ্নেও যাহ পাইবার জন্য চিত্ত ভাবে নাই, আশা তাহাও সতত দিতে স্বীকৃত। যাহা ঘটিবে না বলিয়া সবিশেষ বিশ্বাস আছে, আশা, আমার যাতনা বাড়াইবার নিমিত্ত, তাহাও ঘটাইতে উদ্যত। কুত্রাপি তাহার মনোরথ সফল হয় না তো। আমার প্রমত্ত আশার নিষ্ফলতা নিত্য সহচর। তবু আশা ছাড়ে কই? নিরুদ্যম হইয়া পশ্চাৎপদ হয় কই? ক্লান্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দেয় কই? এ পাপ, নির্ব্বোধ, উন্মত্ত আশা ছাড়ে কই?— এই দেখ—দুষ্ট আশা আমার মানস নেত্রের সম্মুখে কি মনোহর চিত্র উপস্থিত করিতেছে। ঐ দেখিতেছি—এতদিনে পাষাণীর গর্ব্ব গিয়াছে —এতদিনে মন্দভাগিনী বুঝিয়াছে, এ জগতে আমার প্রণয় অতুলনীয় সম্পত্তি। এখন নিদারুণ অনুতাপানলে

তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে—তাহার সে রূপরাশি অন্তরিত হইয়াছে—দারুণ ক্ষীণতা তাহার অপূর্ব্ব সৌকুমার্য্যের স্থানাধিকার করিয়াছে—তাহার প্রতপ্ত স্বর্ণবৎ মনোহর বর্ণ মলিন হইয়াছে—উজ্জ্বল, সতেজ, আয়ত লোচনের আর সে ভঙ্গী নাই, তাহা কোটর মধ্যগত হইয়া, সমস্ত সংসারের প্রতি ক্ষীণ ও বিষণ্ণ ভাবে দৃষ্টিপাত করিতেছে। সে বেশ-ভূষা নাই, সে পক্ষী নাই, উদ্যানের সে রমণীয়তা নাই। আমারই চিন্তায় তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ওঃ কি শোচনীয়! ঐ যেন আবার দেখিতেছি—সেই মলিনা, শয়ন করিয়া উপাধানে বদন লুকাইয়া, কেবল আমারই জন্য কাঁদিতেছে। এ চিন্তাও সহে না যে! তাহার কষ্ট মনে হইলে বুক ফাটে যে। তাহার কোমল প্রাণ, এত যাতনা সহিবে কেন? ও কি কথা? কাঁদিতে কাঁদিতে সুন্দরী ও কি বলিতেছে? "দাসীর চরম কাল উপস্থিত; অন্তিম সময়ে, অপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, একবার শ্রীচরণ দেখিতে দাও নাথ!" এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। আমি শত সহস্র বর্ষ ক্রমান্বয়ে অবক্তব্য যাতনা ভুগিব সেও ভাল, কিন্তু তাহার যেন দিনেকের নিমিত্তও কষ্ট না হয়। বাস্তবিকই কি

তাহার এতাদৃশ মতি-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? আশ্চর্য্য কি? সে বালিকা বুঝিতে পারিত না, কি ভাল কি মন্দ। এই জন্যই সে আমার পবিত্র প্রণয় উপেক্ষা করিয়াছিল। এক্ষণে উপায় কি? কি করিলে তাহার এই যাতনার অবসান হয়? তাহার অপরাধের যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

হায়! কোকিল! দেখ আমার আশার কি ভ্রম! আমি আশার কুহকে পড়িয়া কি সুখস্বপ্নই দেখিতেছি দেখ। হায়! কোথায় বা সে, আর কোথায় বা আমি; কোথায় বা অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, আর কোথায় বা আমার ভ্রান্ত আশা ও সুখ। আমার অদৃষ্ট-পত্রে সে সুখলিপি লিখিত হয় নাই। এ সংসার সুখের স্থান নহে —অন্যের হইলেও, আমার পক্ষে নহে বুঝিলাম, তাহার ধ্যানে রত থাকিয়া, চিরদিন এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার জীবন পর্য্যবসিত হইবে।

কিন্তু কোকিল! তোমাকে একটী পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। এ অরণ্যে আমার আর কে আছে? কোকিল! তুমি যদি পার, আমাকে সৎপরামর্শ দেও। আমি আর একবার তাহাকে দেখিব মনে করিতেছি। ইহাতে

তোমার কি মত? কৈ তুমি মত ব্যক্ত করিলে না তোমার মত যাহাই হউক, আমি আর একবার তাহাকে দেখিব। আর একবার দেখিব কেন? হৃদয়-হীন পাষাণ-খণ্ড আবার দেখিবার প্রয়োজন? যাহাকে ভুলিতে চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ, তাহাকে আবার দেখিবার আবশ্যক? কথা সত্য বটে। সে মানবরূপিণী পাষাণখণ্ড, তাহাকে আর না দেখাই মঙ্গল, তাহা আমি জানি; তোমার কেন, সকলেরই তাহাই মত, তাহাও বুঝিতেছি; তথাপি কোকিল! আমি তাহাকে আর একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বিশেষ জানিতেছি, তাহাকে দেখিলে যাতনার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইবে না, তবু কোকিল! তাহাকে আর একবার না দেখিয়া থাকিতে পারিতেছি না। আর একবার দেখিব—হয়ত পাষাণ গলিবে, হয়ত স্রোতের বেগ ফিরিবে, হয়ত অসময়ে বসন্তের আবির্ভাব হইবে, হয়ত সহসা ভাগ্য-পাদপে শুভফল জন্মিবে, হয়ত আমার চিরসঞ্চিত দুরাশা ফলবতী হইবে। পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নহে, কিছুই অবিশ্বাস্য নহে। মানব মনের কখন কি পরিবর্ত্তন হয় তাহা কে বলিতে পারে? আমি কল্যই আবার তদুদ্দেশে যাত্রা করিব। কল্যই বা কেন,

আমার এখানে কে বা আছে, আমি অদ্যই—এখনই—যাই না কেন?

ও কি কোকিল! তুমি এতক্ষণ আমার দুঃখের কথা শুনিয়া, এখন উড়িয়া গেলে কেন? কথা তোমার ভাল লাগিল না?—তা যাও, আমি আমার সংকল্প ত্যাগ করিব না। আমি জানি এ সংসারে কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাতে নিশ্চয়ই আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি হয়ত আমার সেই শুভ সম্ভাবনায় হিংসা-পরবশ হইয়া, প্রস্থান করিলে। তুমি যাও—আমি আর তোমার মুখাপেক্ষা করিব না। আমিও চলিলাম।

ভগবন্! দুঃসহ যাতনা হেতু চিত্তের স্থৈর্য্য থাকে না। এই জন্য হে অনাথনাথ আমি তোমার প্রতি অভক্তি প্রকাশ করিয়া পতিত হইয়াছি। দয়াময়! দীনবন্ধো! এ পতিতাধমের এই ঘোর দুষ্কৃতি তুমি মার্জ্জনা কর। বিপদকালে, হে জগদীশ! তুমিই একমাত্র শরণ্য—তুমিই সহায়। হে ঈশ্বর! হে পতিতপাবন! আমার সহায় হও—সঙ্গী হও, আমার আশা চরিতার্থ কর।

প্রেম-পরিণাম।

(গদ্য কাব্য)

দ্বিতীয়াংশ—অনুতাপ।

নায়িকা ও ছুরিকা।

যাহা গেল তাহা তো আর আসিল না। দিবাকর! প্রতিদিন সায়ংকালে তোমাকে পশ্চিম গগনে অস্ত যাইতে দেখি, কিন্তু সেই অস্তই তোমার শেষ নয় তো? নিশানাথ! পৌর্ণমাসীর বিমল আলোক তোমার চিরস্থায়ী সম্পত্তি নয় বটে, কিন্তু মাসে মাসে তুমি তো সেই সম্পত্তির পুনরধিকারী হইয়া থাক? প্রকৃতি! তুমি এক্ষণে শ্রী-হীনা, কিন্তু সময়ক্রমে তোমার বসন্ত পুনরাগমন করিয়া, তোমাকে তো বিভূষিতা করিবে?

কোকিল! আজি তোমার সে মোহন স্বর বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু দশ দিন পরে তো তুমি, সেই স্বর পুনরায় লাভ করিয়া, লোকের চিত্ত হরণ করিবে? হায়! সকলেরই যাহা যায়, তাহা আবার আইসে, কিন্তু এ অভাগিনীর যে অমূল্য সম্পত্তি গেল, তাহা তো আর আসিল না। কেবল আসিল না নয়; রোদনে, অনুতাপে, যাতনায়, মর্ম্ম-পীড়ায় কাতর হইয়া দেশে দেশে ফিরিলাম, তথাপি বারেক সে অতুল নিধির পুনর্দ্দর্শন-লাভও ঘটিল না। অভাগিনীর যাহা গেল, তাহা আর আসিল না।

অদৃষ্ট! তোমায় ধিক্! যাহা প্রকৃতির নিয়ম, যাহাতে সাধারণের অধিকার, যাহা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা, আমার পোড়া অদৃষ্ট তাহাতেও বঞ্চিত। আমার প্রতি বিধাতা বাম। বিধাতা সকলের করুণায় কর্ণপাত করেন, সকলের প্রার্থনা পূরণ করেন, সকলের অভীষ্ট সিদ্ধ করেন, কিন্তু এমনই আমার কপাল—আমার প্রার্থনা তাঁহার কর্ণগোচর হয় না। হতভাগিনীর অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ।

কিন্তু আমার অদৃষ্টেরই বা দোষ কি? আমার সৌভাগ্যের সীমা ছিল না তো! আমি যাহার জন্য

কাঁদিতে কাঁদিতে দেশে দেশে ফিরিতেছি, সে তো আমার জন্য কতই কাঁদিয়াছে; সে তো আমার কতই উপাসনা করিয়াছে; আমার অনুগ্রহ লাভার্থ সে কোন কার্য্যেই পশ্চাৎপদ হয় নাই তো। সে তো সম্পূর্ণ হৃদয় আমাকে দিয়াও, নিয়ত ভাবিয়াছে যে, কিছুই দেওয়া হয় নাই। তবে আমার অদৃষ্ট মন্দ কিসে? যাহা দেব-দুর্ল্লভ সামগ্রী, তাহা তো আমার চরণতলে ছিল। কিন্তু হায়! সে নিধি এখন কোথায়? কাহার দোষ দিব? কি বলিয়া মনকে প্রবোধ দিব? আমি আপন পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছি। হায়! এ দুঃখের কথা কে বিশ্বাস করিবে?

এ ঘটনা কেন ঘটিল? কেন এ ভয়ানক পাপকা আমাদিগকে চিরজীবনের জন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল? কাহার দোষে এ অচিন্তনীয় অনর্থের উৎপত্তি হইল? তাঁহার কি দোষ? প্রাণনাথ পাপী নহেন। হৃদয়েশ! তোমার গুণের সীমা নাই। এই মন্দভাগিনীই সমস্ত পাপের নিয়ন্ত্রী। আগে কেন বুঝি নাই? কেন পূর্ব্বে হৃদয়ে এ প্রবৃত্তি জন্মে নাই? কেন আমার কুটিল মতি আগে এরূপ হয় নাই? আগে যদি বুঝিতাম যে,

পাষাণ দেহে-শোণিত-শিরা থাকে, আগে যদি জানিতাম যে, নীরস বালুকার তলে ফল্গু অলক্ষিত ভাবে বহে, তবে আজি আমাকে কাঁদিতে হইত না; তাহা হইলে আমার আর এ দশা হইত না।

যখন প্রাণনাথ আমার চরণ ধরিয়া রোদন করিয়াছেন, তখনও আমার এ ভ্রান্তি কমে নাই তো? যখন সেই অতুল নিধি আমাকে নানা উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখন তাহাতেও বুঝি নাই তো! যখন সেই হৃদয়-রত্ন, এ ব্যবহারের জন্য আমাকে কোন না কোন সময়ে যাতনা পাইতে হইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন, তাহাতেও আমার চৈতন্য জন্মে নাই তো?

কিন্তু এখন যাহা বুঝিতেছি, আগে তাহা বুঝি নাই কেন? আজ্ যে যাতনায় হৃদয় পুড়িতেছে, আগে তাহা হয় নাই কেন? অধুনা যে জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, পূর্ব্বে তাহা আচ্ছন্ন ছিল কেন? এ কথার উত্তরে কি বলিব? কি বলিয়া এ ঘোর অত্যাচারের বিলোপ করিব? যৌবন-তেজ মনুষ্যকে অন্ধ করে। ভাল দুই বৎসর পূর্ব্বেও আমার যে যৌবন-তেজ ছিল, এখনও তাহাই আছে তো। কে আমাকে দেখিয়া এখন প্রবীণা মনে করে? তবে

যৌবনের তেজ এ অপকর্ম্মের কারণ নহে। সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে, মনুষ্য না বুঝিয়াও, নানা গর্হিত কার্য্য করিয়া থাকে। শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে আমি জীবিতেশ্বরের সে অতুলনীয় প্রেম বুঝিতে পারি নাই। এ কারণও যথার্থ নয়। যে শিক্ষা ও সংসর্গের দোষে প্রথমে তাঁহার উদার প্রেমের অপার মহিমা ও অসীম গৌরব বুঝিতে পারি নাই, সেই শিক্ষা ও সংসর্গ সত্ত্বেও তো জানিতে পারিয়াছি যে, আমি দেব-দুর্ল্লভ রত্ন পদাঘাতে নষ্ট করিয়াছি, পিত্তল-ভ্রমে কাঞ্চনে বঞ্চিত হইয়াছি এবং চণ্ডাল-জ্ঞানে দেবতাকে তুচ্ছ করিয়াছি। কিন্তু আগে না বুঝিয়া এখন বুঝিতেছি কেন? কি বলিব কেন? বুঝি প্রেম চাপা থাকে, বুঝি ভালবাসা সকল সময় বুঝা যায় না, বুঝি মোহ ও মাৎসর্য্য পবিত্র প্রণয়কেও পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে। তাহাই বটে— নচেৎ আর কি? পোড়া বুদ্ধির দোষেই আজ্ আমার এ যম-যন্ত্রণা। যখন প্রাণনাথ হৃদয় ভরিয়া, প্রণয়ের ডালি সাজাইয়া আমাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছেন, তখন ভাবিয়াছি, এ জগতে স্ত্রী-জাতির এরূপ উপহারে ন্যায়ানুযায়ী অধিকার আছে; তখন ভাবিয়াছি, স্ত্রী দেবতা, পুরুষ

উপাসক; তখন ভাবিয়াছি, এইরূপে রমণী-পূজা করাই পুরুষের ধর্ম্ম। যখন হৃদয়েশ অতি দীন ভাবে আমার করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন, তখন ভাবিয়াছি, সহজে হৃদয় দান করা স্ত্রী-চরিত্রে নিষিদ্ধ; তখন ভাবিয়াছি, ভিক্ষুকের কি সীমা আছে! তখন ভাবিয়াছি, প্রণয় কখনই এত অল্প-মূল্য সামগ্রী নহে। যখন সেই সর্ব্বস্ব ধন, আমার উপেক্ষার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, যার-পর-নাই যাতনা ভোগ করিয়াছেন, তখন ভাবিয়াছি, পুরুষকে যাতনা দেওয়া স্ত্রী-লোকের একটা প্রধান ধর্ম্ম; তখন ভাবিয়াছি, সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ; রত্ন লাভার্থ যত্নের প্রয়োজন। আয়াসের তারতম্যানুসারে অর্জ্জিত দ্রব্যের প্রতি আদরের তারতম্য হয়; অতএব আগ্রহের চরম না দেখিয়া, এ দুর্লভ ধন বিলাইব কেন?

কিন্তু এখনই বা মতের এতাদৃশ অন্যথা কেন? তাহার অনেক কারণ। এখন দেখিতেছি, হৃদয়েশের সেই যে ভালবাসা, তাহার তুলনা এ জগতে আর পাওয়া যায় না। তাহা বস্তুতই দেব-দুর্লভ সামগ্রী—মহার্হ রত্ন। এখন দেখিতেছি, প্রাণেশের সেই প্রেম ব্যতীত আর যত প্রেম সকলই লিপ্সা, মোহ, বিকার ও কপটতায় পূর্ণ।

স্বর্গে ও নরকে যে প্রভেদ, হৃদয়নাথের সেই পবিত্র প্রণয়ের সহিত সাধারণ লোকের সাধারণ ভালবাসায় তত প্রভেদ; এ কথা এখন বুঝিতেছি। সেই ভুবন-মোহন কান্তের বিচ্ছেদ আমাকে এখন এই সকল শিক্ষা দিয়াছে। সে রত্ন না হারাইলে, তাহার এ মহিমা ও গৌরব বুঝিতে পারিতাম না। যে দ্রব্য আছে, তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায় না। যে নিত্য স্বর্গবাসী, সে স্বর্গের উৎকর্ষ বুঝে না; যে কষ্ট না পাইয়াছে, সে সুখ জানিতে পারে না; যে না ঠেকিয়াছে, সে শিখিতে পারে না; যে যাহা না হারাইয়াছে, সে তাহার জন্য কাঁদে না। প্রাণেশের বিচ্ছেদাগ্নি, আমার হৃদয় দগ্ধ করিয়া, ইহাকে প্রদীপ্ত করিয়াছে। অতুল্য সামগ্রী বোধে, কৃপণের ধনের ন্যায়, যে প্রেম-রত্ন কাহাকেও দিব না ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখিতেছি তাহা আমার ধন নহে; তাহা রাখিতে আমার অধিকার বা ক্ষমতা নাই; তাহা বিনিময়ের সামগ্রী। একজন তাহার বিনিময়ার্থ তদনুরূপ—না, তদপেক্ষা বহু গুণে মূল্যবান্ সম্পত্তি দান করিয়াছে, অথচ এ পর্য্যন্ত তাহার প্রাপ্য তাহাকে দেওয়া হয় নাই।

এ সংজ্ঞান—এ পাপ জ্ঞান এখন কেন জন্মিল? এ

দুঃসহ, অদম্য জ্ঞানের অপেক্ষা পূর্ব্ববৎ জ্ঞানহীনা থাকা শতাংশে শ্রেয়ঃ ছিল। এ অসহনীয় যাতনার অপেক্ষা, চিরকাল নরকে পচিয়া মরা ভাল ছিল। এ যাতনা আর সহে না। কি করিলে, হে ভগবন্! এ দুস্তর যাতনার অবসান হয়? দয়াময়! আমার যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, অতঃপর আমাকে মার্জ্জনা কর; তোমার চরণে ধরি, আমাকে ক্ষমা কর। হে অনাথনাথ ভবেশ! আমাকে বারেক সেই মোহন মহাপুরুষের সমীপস্থ কর।

হায় কি বৃথা কথা বলিতেছি! এরূপ বিবেক-বিহীনা পাপীয়সীর কথায় বিধাতা কর্ণপাত করিবেন, এও কি কখন সম্ভব? যদি বিধাতার শরণ গ্রহণ করিলে যন্ত্রণার শান্তি হয়, তবে এ ঘোর পাপের শাস্তি হইবে কিরূপে? পাপীর দণ্ড কদাপি এত লঘু হইতে পারে না। কিন্তু বিধাতার নাম উচ্চারণে আমার অধিকারই কি? দয়াময় জগদীশ্বরের পবিত্র নাম, এ অপবিত্র রসনা হইতে উচ্চারিত হইবার যোগ্য নহে। যে দুশ্চারিণী, হাসিতে হাসিতে, গুণময় প্রেমময় কান্তকে অকারণে নিয়ত যন্ত্রণার অনলে দগ্ধ করিয়াছে; যে পাষাণী, সেই পুরুষ-রত্নের মর্ম্মান্তিক রোদন দেখিয়া, এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন

করা দূরে থাকুক, বরং হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিয়াছে; যে হৃদয়-হীনা অবিরত যাতনা-বিষে সেই গুণধামের অন্তর জর্জ্জরিত করিয়া, তাঁহাকে চিরকালের নিমিত্ত সমাজ হইতে বিদূরিত করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ যাহার দুর্ব্ব্যবহার জনিত অসহ্য যন্ত্রণা হেতু, তাঁহার জীবনের অবসানও—ওঃ ভগবন্! আর না। দুঃখিনী পাপীয়সীর ক্লেশের পরাকাষ্ঠা হইয়াছে! যাহা ভাবিতেও শোণিত শুষ্ক হয়, আমার আত্মা, অন্তরের অন্তর কাঁপিয়া উঠে, তাহা যেন না ঘটে। যে পাপীয়সী পাপের উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছে, বিধাতার নাম উচ্চারণে তাহার কোনই অধিকার নাই। বিধাতার নাম স্মরণে আমার নিস্তারের আশা নাই। আমার নিস্তারের অন্য উপায়ও নাই তো।

তবে এখন ক্রন্দন আমার নিয়তি; যাতনা আমার সহচর; অনুতাপ আমার নরক। নরক—হাঁ—নরক —জীবনাবসানে নয়—কে বলে স্বর্গ ও নরক পরকালে? নরক পরকালে নয়। স্বর্গ ও নরক ইহ জীবনে। আমার নরক জীবন্ত। মৃত্যুর পর, আমার নিমিত্ত, না জানি কি নূতন নরক সৃষ্ট হইবে। কিন্তু যতই হউক, আমার

পাপের উপযুক্ত শাস্তি কিছুই নহে। যে দুষ্কর্ম্ম আমি করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত শাস্তি অসম্ভব।

কিন্তু মৃত্যুর পরে কি হইবে, ভাবিয়া ইহ জীবনে আর কত কষ্ট সহিব? এ যাতনা, আমার ন্যায় পাষাণ-ময়ী না হইলে, কেহই এত দিন সহিতে পারিত না। আমার হৃদয় লৌহময়, বজ্রময়, বা তদপেক্ষাও কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত। কিন্তু আমিও আর পারি না তো।

এ কষ্ট আর সহে না। মৃত্যু আসিয়া আমাকে গ্রাস করিবে না। বিধাতা আমার জীবন্ত নরক ব্যবস্থা করিয়া-ছেন,—মৃত্যু হইলে সে দণ্ড পূর্ণ হয় কই? আমার মৃত্যু হইবে না। তবে আত্মহত্যা ভিন্ন আমার নিষ্কৃতির উপায় কি? আমি তাহাই করিব। আমি আত্মহত্যা দ্বারা এ ভারভূত, পাপ-পীড়িত দেহ বিসর্জ্জন দিব। পরকালে যাহা হয় হইবে—আমি এ জীবন রাখিব না।

তবে আইস ছুরিকে! এ অন্তিম সময়ে তুমিই আমার বন্ধু; তোমার আলিঙ্গনই এক্ষণে আমার একমাত্র প্রার্থনীয়। তুমি আমাকে নিস্তার কর। ছুরিকে! তোমার অনুগ্রহে এ ভব যন্ত্রণা বিদূরিত হইবে বটে, কিন্তু আমি এ সংসারে যে কীর্ত্তি রাখিয়া চলিলাম, তাহা লোকে

চিরকাল ঘৃণার সহিত শুনিবে; আমার নাম ধিক্কারের আস্পদ হইবে; পাপের উপমা-স্থল থাকিবে। আমার এ অপকীর্ত্তি, এ পাপ, এ কলঙ্ক, এ লোমহর্ষণ ব্যবহার, যে শুনিবে, সেই শিহরিবে। আমার এ কলঙ্কিত নাম যেখানে উচ্চারিত হইবে, সেখানেই লোকে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া, সরিয়া যাইবে। তাহাতেও আমি কাতর নহি; কারণ আমার তাহাই উপযুক্ত সৎকার। মৃত্যুর পর যাহা হয় হউক, কিন্তু জীবনে যে যাতনা সহিতেছি, তাহা তো আর সহিতে হইবে না!

তবে আইস ছুরিকে! তোমার সাহায্যে এ পাষাণ-দেহ হইতে প্রাণ-বায়ু দূরীভূত করিয়া দিই। ছুরিকে! আমার এ ভারভূত জীবনের তুমিই একমাত্র আশ্রয়—আমার হস্তে আর তোমার থাকিবার আবশ্যক নাই, তুমি আমার হৃদয়ে আমূল প্রবেশ কর। যে পাষাণ-হৃদয় এত দুষ্কর্ম্মে সমর্থ, হয় তো ছুরিকা, তোমার সহায়তাতেও তাহাকে পরাভূত করিতে পারিব না। হস্ত! তুমিও কি হীনবল? এই শাণিত ছুরিকা তুমি সজোরে আমার বক্ষ-মধ্যে আমূল প্রোথিত করিতে পারিবে না কি? যে হৃদয়ের প্রবঞ্চনায়, প্রাণনাথ! তোমাকে চিরকাল অশ্রু-

জলে ভাসাইয়া সংসার-ত্যাগী করিয়াছি. অদ্য স্বহস্তে সেই হৃদয় খণ্ড খণ্ড করিব। প্রাণেশ্বর! হৃদয়েশ! দুঃখিনীরতন! জীবিতেশ্বর! তোমাকে কি বলিব? কত কথাই তো বলিবার আছে, কিন্তু এখন যদি তোমার সাক্ষাৎ পাই, তাহা হইলে কোন কথাই তো বলিতে পারি না। আমি কি বলিয়া তোমার সঙ্গে কথা কহিব? তোমাকে কিছুই বলিবার মুখ নাই। তবে তোমার উদ্দেশে, জীবিতেশ! দুই চারিটি কথা না বলিয়া এ পাপ-পঙ্কিল দেহ বিসর্জ্জন দিতে পারিতেছি না তো। হে দয়াময় বিধাতঃ! হে বনচরগণ! হে বনস্পতিসমূহ! তোমাদের যদি এরূপ পাপীয়সীর অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে আমার এই শেষ অবস্থাটা দয়া করিয়া একবার প্রাণনাথকে জানাইও।

প্রাণনাথ! আমি তো চলিলাম; এ সংসার হইতে আমার এ পাপ-নাম তো ডুবিতে চলিল; এ পাপ-পঙ্কিল দেহ তো অবিলম্বে প্রাণহীন হইবে; আমি যে কীর্ত্তির জন্য জন্মিয়াছিলাম, তাহার তো এখনই অবসান হইবে। এ অন্তিম সময়ে,—এ মরণকালে, আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, ইহ জীবনে যাহা হইল না, পর জীবনে যেন তাহা

ঘটে। আর কিছু হউক বা না হউক, নাথ! নরকে থাকিয়াও একবার যেন তোমাকে দেখিতে পাই। তাহা হইলে সেই নরকেও আমি স্বর্গাপেক্ষা সুখ লাভ করিব। আর প্রাণেশ্বর!—আর কি বলিয়া বলিব? কোন্ মুখে সে কথা পাড়িব? প্রাণেশ্বর! তুমি করুণাসিন্ধু। তুমি এ পাপীয়সীর দোষরাশি ক্ষমা করিলে করিতে পার—কিন্তু নাথ! আমি তো ক্ষমার যোগ্য নহি। দয়াময়! আমায় ক্ষমা করিবে কি? হৃদয়েশ! যদি প্রবৃত্তি হয়, এ পরিতাপিনীর কলুষরাশি বিস্মৃত—না না, বিস্মৃত হওয়া অসম্ভব—ক্ষমা করিও। তোমার চরণোদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়া, তোমার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে, আমি স্বহস্তে আত্ম-জীবন বিনাশ করিয়া, আমার এ ঘোর পাপের যদি প্রায়শ্চিত্ত সম্ভবে—তবে তাহাই করি। আর না। হস্ত প্রস্তুত হও—ছুরিকে আইস—

—নাথ—ক্ষমা—ওঃ—

প্রেম-পরিণাম।

(গদ্য কাব্য)

তৃতীয়াংশ—শেষ।

পাঠক ও লেখক।

এই শোচনীয় ব্যাপারের শেষ অংশ আমাদিগকেই বিবৃত করিতে হইল; এই শোণিতাক্ত ঘটনার শেষ কথা আমাদিগকেই প্রকাশ করিতে হইল। অপরিণাম-দর্শী যুবক-যুবতীর হৃদয়ক্ষেত্রে যে প্রণয়-বীজ অসময়ে ও অবিবেচনায় উপ্ত হইয়াছিল, তাহার ফল বিষময় ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সেই বিষময় ফলের শেষ ভয়ানক কথা আমাদিগকেই লিপিবদ্ধ করিতে হইতেছে।

যুবতী, যখন বক্ষ-মধ্যে আমূল ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া,

শোণিতাক্ত ও হতচেতন হইয়া পতিত হইলেন, দৈবের প্রতিকূলতা হেতু, যুবকও সেই সময়ে সেই রুধির-প্লাবিত ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত। রমণী-কণ্ঠ-নিঃসৃত, মৃত্যু-যাতনা-জনিত ভয়ানক কাতর ধ্বনি শ্রবণে, তিনি ত্বরায় সুন্দরীর সমীপস্থ হইলেন। দেখিলেন—ভয়ানক! যাহা ভ্রমেও ভাবেন নাই, স্বপ্নেও যাহা মনোমধ্যে উদিত হয় নাই—তদধিক শোচনীয় ঘটনা! যাহার জন্য তিনি সংসার-ত্যাগী, যাহার চিন্তায় তিনি উন্মাদ-গ্রস্ত, যাহার নিমিত্ত তিনি উদাসী, তাহার আজি এই দশা! ধীরে ধীরে যুবতীর পার্শ্বে যুবক উপবেশন করিলেন;—চক্ষে নিমেষ নাই, মুখে কথা নাই, অঙ্গে অনুভূতি নাই। শোণিত স্থির, হৃদয় বহ্নি-চর্ব্বিত, সংসার শূন্য,—যেন অনন্ত সমুদ্র-বক্ষে তিনি একাকী সমাসীন। যুবতীর চক্ষের সহিত তাঁহার চক্ষু সম্মিলিত হইল; সেই মৃত্যু-পীড়িত নেত্রও যেন তখন প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল। যুবতী তখন ধীরে ধীরে যুবকের পদ স্পর্শ করিলেন। যুবক, উন্মত্তের ন্যায় বিকম্পিত কণ্ঠে, কহিলেন,—

"হৃদয়েশ্বরি! এই কি আমার প্রেম-পরিণাম?"

যুবতী অতি ক্লিষ্ট স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"নাথ! দয়াময়! অপরাধ ক্ষমা কর।"

যুবক পুনরায় আর্ত্ত স্বরে বলিলেন,—

"এ ভয়ানক কার্য্যে কেন তোমার মতি হইল?"

আবার ভগ্নস্বরে যুবতী উত্তর দিলেন,—

"যে মতি ছিল না বলিয়া এত যাতনা, সেই মতিই ইহার কারণ; তুমি আমাকে চরণ ধূলা দেও।"

অতি সতর্কতা সহকারে যুবক, যুবতীর সেই ক্ষীণ তনু, ক্রোড়ে উঠাইলেন। কি আশ্চর্য্য! মৃত্যু-যাতনাকে পরাভূত করিয়া, সুন্দরীর বদনমণ্ডলে আনন্দ-জ্যোতিঃ ক্রীড়া করিতে লাগিল। যুবতী কহিলেন,—

"নাথ! মৃত্যু তো উপস্থিত। কিন্তু যে যাতনা তোমাকে দিয়াছি, ইহাতেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল না তো।"

যুবক কহিলেন,—

"যাও সাধ্বী, স্বর্গ তোমাকে লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইবে। তোমার গুণ কেহই ভুলিবে না।"

সেই কৃতান্ত-কবলিত বদনে হাস্যের আবির্ভাব হইল। সেই হাসিই এ পাপ-তাপ-পূর্ণ সংসারে তাঁহার শেষ কার্য্য হইয়া রহিল; প্রাণ-বায়ু তাঁহার দেহ হইতে

প্রস্থান করিল। বৃন্ত-চ্যুত প্রফুল্ল প্রসূনের ন্যায়, সুন্দরী প্রাণহীনা হইলেন। অসময়ে, নবীন যৌবনের সুন্দর বিকাশ কালে, সুন্দরী তরুণী, অনুতাপানলে বিদগ্ধ হইয়া, দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত বিধানার্থ, স্বয়ং স্বেচ্ছায়, স্বীয় নবনীত-বিনিন্দিত কোমল দেহ হইতে জীবন বিচ্ছিন্ন করিলেন।

যুবক নির্নিমেষ। এক ফোঁটা অশ্রুও এই ভয়ানক সময়ে তাঁহার দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মাইল না। তিনি, হাসিতে হাসিতে মৃতার বদন চুম্বন করিয়া, কহিলেন,—

"ভাবিয়াছ কি, এই যাতনা আমি সহিব?"

যুবক, সুন্দরীর বক্ষ-মধ্য হইতে, ছুরিকা উন্মুক্ত করিলেন। পুনরপি হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—

"দেখ প্রিয়ে! তোমার শোণিতে আমার শোণিত মিশিলে কেমন দেখায়।"

তৎক্ষণাৎ সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা যুবকের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি চেতনা-হীন হইয়া ক্রোড়-শায়িনী সুন্দরীর উপর পড়িয়া গেলেন। হায়! জীবনে যাহাদের মিলন ছিল না, অন্তিমে তাহাদের মিলন হইল।

অন্তিম সময়ে উভয়ের ওষ্ঠে ওষ্ঠ, অধরে অধর ও হৃদয়ে হৃদয় মিলিল। যাতনার একতা, মৃত্যুর একতা, শোণিত-পাতের একতা—মৃত্যু সময়ে তাঁহাদের সর্ব্বথা একতা হইল।

হায়! জীবনে তাঁহাদের একতা হয় নাই কেন? মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাদের মিলন হয় নাই কেন? জীবনে যদি তাঁহাদের মিলন বা একতা ঘটিত, তবে এরূপ যন্ত্রণায় জীব-লীলা সাঙ্গ করিয়া, অকালে ভব-রঙ্গ-ভূমি হইতে তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে হইত না। হায়! তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন-নাটকের যবনিকা পাত এতাদৃশ ভয়াবহ ঘটনায় পর্য্যবসিত হইত না। জীবনে মিলন ও একতা হয় নাই বলিয়াই, এ প্রণয়-তরুতে এই বিষময় ফল ফলিল। যত্নে বা আদরে, রোদনে বা অনুতাপে, উপদেশে বা শিক্ষায়, ইহার ফল অন্যবিধ হইত না। অপাত্রে বা অসময়ে প্রেম জন্মিলে, পরিণামে তাহা পরিতাপের কারণ হইবেই হইবে। তাই বলিয়া যদি তুমি প্রেমের স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমাকে বিফল-প্রযত্ন হইতে হইবে। প্রেম

কি রোধ করিবার সামগ্রী? উপদেশ দ্বারা প্রেমের পাত্র নির্ব্বাচন করিতে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। প্রণয় স্বয়ং উদ্ভূত হয়, স্বয়ং প্রবাহিত হয়, অন্য প্রবাহে স্বীয় উত্তাল বারি-রাশি ঢালিতে না পাইলে, কূল প্লাবিত করিয়া আপনিও ভাসে, অপরকেও ভাসায়। তুমি প্রণয়কে উপদেশ দিও না, তাহাতে তাহার গতি রোধ হইবে না। শিক্ষা লইয়া তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইও না, প্রণয় সে সম্বন্ধে অন্ধ; যত্ন বা আদর দেখাইয়া প্রণয়কে ভুলাইতে যাইও না, প্রণয় ভুলিবার পাত্র নহে। যত্নে বা আদরে, অযত্নে বা অনাদরে তাহার সমান বৃদ্ধি। যদি তুমি কোন স্থলে এ সত্যের বিরোধ দেখিয়া থাক,—জানিও, তথায় প্রণয়ে পবিত্রতা নাই। সে প্রণয় হাটের সামগ্রী। কথা দিলে, যত্ন দিলে, আদর দিলে, অর্থ দিলে সে প্রণয় কিনিতে পাওয়া যায়। তাহা কৃত্রিমতা, বিকার, মোহ, লিপ্সা প্রভৃতির নামান্তর। তাহা হিংস্র সিংহ, নিরীহ মেষ সকলেরই আছে। সে প্রণয়ের সহিত এ প্রণয় মিশাইও না। ছিঃ! সে প্রণয় প্রতি-দান চায়, সে প্রণয়ের লাভের বাঞ্ছা, তাহা ব্যবসাদারী।

আর যাহা প্রণয়, প্রণয় বলিলে যাহা বুঝিতে হয়, যাহা সংসারে অতি দুর্ল্লভ সম্পত্তি, যাহা কল্পনায় আইসে, কার্য্যে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা—(কি বলিয়া বলিব কি?) জীবনে স্বর্গ দিতে পারে, তাহার প্রধান দোষ, সে অন্ধ। তাহাকে তুমি দেও ভাল, না দেও ভাল, সে আপনি অপরকে দিয়া সুখী। সে তোমার নিকট হইতে পাইবার প্রত্যাশা রাখে না। তাহার পাত্রাপাত্র বিচার নাই।

অসময়ে ও অপাত্রে প্রণয়-রত্ন উপহার দিতে গিয়া, সংসারে সময়ে সময়ে যৎপরোনাস্তি বিপদ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। আমাদিগের প্রস্তাব-বর্ণিত ব্যাপার তাহারই একটী দৃষ্টান্ত মাত্র।